হরি যাকে রাখেন

শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়
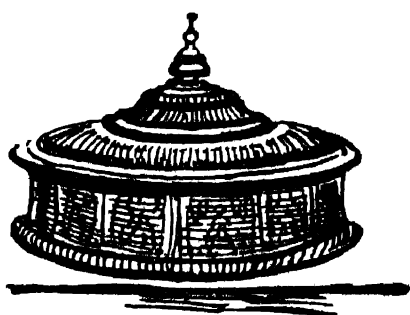
মিত্রালয়
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—তিন টাকা—

এই লেখকের

তত্ত্বাভিলাষীর সাধুসঙ্গ

হিমালয়পারে কৈলাস ও মানস সরোবর

মিত্রালয়, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ও পরিচয় প্রেস, ৮বি, দীনবন্ধু লেন, কলিকাতা হইতে
শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক মুদ্রিত

ভাই সুরেশ, "হরি যাকে রাখেন" তখন অতীব উৎসাহেই "উত্তরা"য় বার করেছিলে,—এখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল,—এখানি তোমাকেই উৎসর্গ করলাম।

টালীগঞ্জ
শ্রাবণ—১৩৫৬

প্রমোদ

অবধূত

—৩৩ পৃষ্ঠা

১

এক সময় কেবল ভ্রমণ করিতাম। এই সময়টি ছিল জীবনের একটি বিশিষ্ট কাল, যখন মুক্তভাবে নানা সম্প্রদায়ের সাধুর সংস্পর্শে আসিয়া অনেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবেই মিশিয়াছিলাম, আর আনন্দ যাহাকে বলে তাহার প্রকৃত আস্বাদ পাইয়াছিলাম। আজ এক প্রচ্ছন্ন অবধূতের কথা বলিতেছি—যাঁহার জন্ম-বিবরণ যেমন অদ্ভুত, কর্ম্ম ও ধর্ম্ম-জীবনও তেমনি আলোকময়। প্রয়াগে তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়, তখন হইতে প্রায় দুই মাস কাল পশ্চিমাঞ্চলে নানাস্থানে তাঁহার সঙ্গ পাইয়াছি। সেই সময় তাঁহার নিজ মুখে জন্ম এবং জীবনকথা যেরূপ শুনিয়াছিলাম প্রথমে সংক্ষেপে আমার নিজের কথায় তাহা বলিয়া পরে, তাঁহার বিচিত্র ধর্ম্ম-জীবনের কথা বলিবার চেষ্টা করিব।

প্রায় ষাট পঁয়ষট্টি বৎসর পূর্ব্বের কথা, তখনও হাঁটা পথে এবং নৌকা-যোগে অনেক তীর্থে যাতায়াত চলিত, রেল পথ বহুদূর বিস্তৃত হয় নাই। সে সময় নবদ্বীপেও নৌকা-যোগেই যাতায়াত চলিতে ছিল। তখন ফাল্গুন মাস, দোলের উৎসব—বাংলার নানা স্থান হইতে বৈষ্ণব-ভক্তেরা আসিয়া মহাউৎসবে যোগ দিয়াছে। নানা স্থান হইতে প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনিয়া আসিয়াছে, মহাপ্রভুর মন্দিরে নিত্য কীর্ত্তন গান ও ভাগবত পাঠ চলিতেছে। পথের ধারে মেলা বসিয়াছে। মোট কথা তখনকার ক্ষুদ্র নবদ্বীপ নগরটি আনন্দের রোলে দিবারাত্র মুখরিত,—সেই সময় একদিন প্রাতে গঙ্গাতীরে এক বিস্ময়কর ঘটনা!

হরি যাকে রাখেন

পূর্ব্ববঙ্গ, ঢাকা অঞ্চলের এক বণিকপরিবার তখন নবদ্বীপে থাকিত। ধনবান ও ধার্ম্মিক তাঁহাদের খ্যাতি। কর্ত্তা পরম বৈষ্ণব, নামটি তাহার বৃন্দাবন সাহা। এখানে তাহার একটি কারবার ও একখানি পাকা বাড়ীও ছিল। এই সময়টিতে প্রতি বৎসর এখানে আসিয়া চার পাঁচ মাস সপরিবারে বাস করিত। প্রত্যহ ভোরে গঙ্গাতীরে কতক্ষণ ভ্রমণ করিয়া সূর্য্যোদয় হইলে স্নান-আহ্নিক শেষ করিত,—তাবপর গৌরাঙ্গ মন্দিরে যাইয়া দর্শনাদির পর বাড়ী আসিয়া বিষয়-কর্ম্মে মনোনিবেশ। ইহাই তাহার নিত্যকার নিয়ম ছিল। এখন এই দোল-পূর্ণিমার উৎসবের সময় একদিন ভোরে বৃন্দাবন গঙ্গাতীবে আসিয়াছে, তখন পূর্ব্বদিক বেশ ফর্সা হইয়াছে—তবে গাছ-পালায়, ঝোপেঝাপে অন্ধকারও কতকটা আছে।

এখনকার মত তখন এতটা চর হাঁটিয়া জলে যাইতে হইত না, কারণ গঙ্গা তখন নিকটেই ছিল। বৃন্দাবন অন্যমনস্ক হইয়া চলিতেছিল,—হঠাৎ নিকটে কোথাও শিশুর কান্নার মত একটা আওয়াজ তাহার কানে আসিল। স্থির হইয়া শুনিলে বোধ হয় ঠিক যেন সদ্যপ্রসূত শিশুর ক্রন্দন। উদ্বিগ্ন চিত্তে তখন চারিদিকে সে চাহিয়া দেখিল।

অস্পষ্ট আলোকে প্রথমে ঠাহর হইল না। কতকটা দূবে যেন সাদা কাপড়ে জড়ান একটা কিছু পড়িয়া আছে, আবছা দেখা গেল। অগ্রসব হইয়া নিকটে গেলে তখন একেবাবে স্পষ্টই শিশুকণ্ঠের কান্না কানে আসিল। দেখিল তাহার ভিতবটা অল্প যেন নড়িয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে আবাব সেই কান্না! তাহাব ভয় হইল এবং দেখিয়া-শুনিয়া বিস্ময়ও তাহার কম হইল না। এখানে এমন সময়ে সদ্যপ্রসূত শিশু কোথা হইতে আসিল! যদিও বৃন্দাবন জানিত এখানে অনেক সময়, বিশেষতঃ পর্ব্ব উৎসবে, নানা উদ্দেশ্যে নানাবিধ যাত্রীর শুভাগমন হইয়া থাকে। কলঙ্কের ভয়ে অনেক পাতকীই শিশু-সন্তানের জন্ম দিয়া, হত্যা করে, গঙ্গায় ফেলিয়া দেয়, আবাব গঙ্গা-গর্ভে পুঁতিয়াও ফেলে। লোক-চক্ষুর অগোচরে তাহাদের ভোগ-জীবনের কণ্টক দূর করিয়া নিশ্চিন্ত মনে স্থানান্তরে চলিয়া যায়। এমন কতদিন সে দেখিয়াছে, শৃগাল, কুকুবে মাটি খুঁড়িয়া ঐ সকল শিশুকে বাহির করিয়া টানাটানি করিতেছে। এসব ত তাহার জানা কথা।

এখন এই যে জীবনটি জনক জননীর স্নেহে বঞ্চিত হইয়া উন্মুক্ত আকাশতলে আশ্রয়ের জন্য করুণকণ্ঠে চিৎকার করিতেছে, ইহার কি গতি হইবে? কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়

অবস্থায় কতক্ষণ দাঁড়াইয়া বৃন্দাবন তাহাই ভাবিতে লাগিল। কোন্ পাতকের ফলে জনক-জননী নিজ সন্তানকে স্বীকার করিল না, এরূপ নিরাশ্রয় নিষ্ঠুরভাবে ত্যাগ করিয়া গেল! রুদ্ধ বেদনায় তাহার বুক ফাটিতে লাগিল। একে হিন্দু, তাহাতে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব শাসিত সমাজে তাহার বাস। কি হইবে তাহার গতি যদি বৃন্দাবন এই শিশুকে তাহার আশ্রয়ে গ্রহণ করে? আকাশ-পাতাল ভাবনা—তাহার মাথায় ভিতর দিয়া যেন ঝড় বহিতে লাগিল।

শিশুটিকে এইমাত্র রাখিয়া গিয়াছে, ব্যাপারটি খুব বেশীক্ষণ হয় নাই। কারণ, তাহা না হইলে এতক্ষণে শৃগাল, কুকুরে ইহার কিছু অবশিষ্ট রাখিত না। হয়ত এই ভোর-বেলায়ই এখানে শিশুটির গতি করিতে আসিয়াছিল, আবার ইহাও হইতে পারে, তাহাকে দূরে আসিতে দেখিয়াই এই অবস্থায় ফেলিয়া তাহারা পলাইয়াছে। এখন দেখিয়া শুনিয়া এই অবস্থায় কি করিয়া এটাকে ফেলিয়া যাওয়া যায়! হরি যখন এখনও ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন, আর তাহারই চক্ষের সম্মুখে এতটা স্পষ্ট করিয়া ধরিয়া দিলেন, তখন আর কারো জন্য ত ফেলিয়া রাখা যায় না,—তাহা হইলে পাতকের শেষ থাকিবে না।

এই সব ভাবিয়া বৃন্দাবন এই সিদ্ধান্তেই দৃঢ় হইল যে, আমাকেই এ শিশুর জীবন রক্ষা করিতেই হইবে। যে যা বলে বলুক, কৃষ্ণের জীব,—আমি ইহাকে গ্রহণ করিব, বাঁচাইব, পালন করিব। তারপর তাহার ভাগ্যে যাহা হয় তাহাই হইবে। এই সঙ্কল্পে বৃন্দাবন যখন স্থির হইল, তখন অন্তরে গভীর স্বস্তি অনুভব এবং ইহার মধ্যে একটি সুস্পষ্ট ভগবৎ-প্রেরণা অনুভূতি,—ফলে অন্তরে অপূর্ব্ব একটি আত্মপ্রসাদ অনুভব করিল।

ততক্ষণে আরও আলো হইয়াছে। দুই চারিজন স্নানার্থী সেখানে দেখা দিলেন। ব্যাপার দেখিয়া নানাজনে নানা কথা আলোচনাও করিতে লাগিলেন, কিন্তু এই হত-ভাগ্যটিকে স্পর্শ করার কথা দূরে থাক্, অসহায় এবং বিপন্ন শিশুর প্রাণ রক্ষা যে আশু প্রয়োজন তাহা কাহারও মনেই হইল না। এই ভাবে যখন তাঁহারা শিশুর ঘৃণিত জন্ম ও জীবন-সমস্যা লইয়া বিব্রত; তখন ধীরে ধীরে সেই প্রৌঢ় বণিক অগ্রসর হইল এবং রক্ত ক্লেদসিক্ত বস্ত্রাভরণ উন্মোচন না করিয়াই শিশুটিকে কোলে লইল। বেশ ভারি বোধ হইল, সে বুঝিল শিশুর তখনও নাড়ি কাটা হয় নাই। কোন দিকে না দেখিয়া শিশুকোলে বৃন্দাবন দর্শকগণের মধ্যে অসীম বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়া দ্রুতপদে নিজগৃহের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিল।

বণিকের এই বিসদৃশ আচরণে সেখানকার সকলেই ব্যথিত হইয়া নিস্ফল আক্রোশের বশে যে সব মন্তব্য পরস্পর প্রকাশ করিতে লাগিলেন তাহাতে আমাদের কোন কাজ নাই। মোট কথা, বৃন্দাবন সাহার শুধু অর্থ নয়, লোক-বলও কম ছিল না। ঘরে

আসিয়া পৌঁছিবামাত্র ধাত্রী আনাইয়া শিশুর নাড়িচ্ছেদ প্রভৃতি কর্ম্ম শেষে ধোয়া-মোছা হইলে দেবশিশুর মত এক সুন্দর শিশুমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিল,—তখন বৃন্দাবন আরও একবার তাহাকে ভগবানের দান বলিয়া গ্রহণ করিল এবং গৃহিণীর কোলে সযত্নে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

এইভাবে একটি অপরিচিত শিশু একদিন হঠাৎ সাহাপরিবারের মধ্যে স্থান পাইল। ক্রমে এখানে নির্দ্ধারিত কাল কাটাইয়া চার মাস পর ধর্ম্মাত্মা বৃন্দাবন সপরিবারে নিজ স্থান পূর্ব্ববঙ্গে চলিয়া গেল। শিশুটির উপর তাহার একটা আকর্ষণ বিশেষরূপেই ছিল, কিন্তু কাহাকেও সে কথা বলিত না। শিশুটিকে বৃন্দাবন ভগবানের দান বলিয়াই মনে করিত। শিশু-সম্বন্ধে কোন জাতীয় বা বিজাতীয় ঘৃণা তাহার প্রশস্ত, উদার এবং প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে কখনও স্থান পায় নাই।

২

বৃন্দাবন তাহার নাম দিলেন কুড়াণরাম—তাহাকে কুড়া বলিয়াই ডাকা হইত।

এখন কুড়ার কথা,—তাহার জন্ম যেমন অদ্ভুত, তাহার বৃদ্ধি, পালিকা মাতার ক্রোড়-আশ্রয়ে তাহার শিশু-শরীরের পরিণতির ব্যাপারও তেমনি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, সে কথাও এখানে কিছু বলিব।

বৃন্দাবনের স্ত্রী, নামটি তাহার সুলোচনা, সংসারে সর্ব্বময় কর্ত্রীত্ব তাহার ছিলনা, কারণ বৃন্দাবনের বিধবা খুড়ি এবং বিধবা জ্যেষ্ঠা ভগিনী তাহার সংসারে বর্ত্তমান। তখনকার দিনে ঐরূপ আত্মীয়া যাহারা থাকিত, তাহারাই হইত সংসারের কর্ত্রী। একটু বেশী বয়সেই বৃন্দাবনের দুইটি পুত্র হইয়াছিল। চিন্তাহরণ আর গোবিন্দ, বড়টি পাঁচ, ছোটটি তিন বৎসরের। তারপর সম্প্রতি একটি কন্যা, আঠারো দিনে, সূতিকা-গৃহেই মারা যায়, ইহা নবদ্বীপ যাইবার ঠিক পূর্ব্বের কথা। তখনও সুলোচনার স্তন শুকাইয়া যায় নাই, তাহাতে দুগ্ধ ছিল প্রচুর। তাহাই এখন কুড়ার বাঁচিবার পক্ষে হইয়াছিল প্রধান সহায়। দুঃখের কথা এই যে সুলোচনা কিন্তু তাহাকে সুনয়নে দেখে নাই।

চরিত্রবান বৃন্দাবন, অল্পভাষী, অত্যন্ত রাসভারী লোক বলিয়া গৃহিণীর বেশ একটু ভয় এবং ভক্তি তাহার প্রতি ছিল। তাহার উপর সুলোচনা দরিদ্র পিতামাতার সন্তান। বিধাতার নির্ব্বন্ধে, শক্তিমান, ধন-সম্পত্তি এবং সমাজে প্রতিপত্তিশালী বৃন্দাবনের গৃহিণী হইয়া তাহার নারীজন্ম সার্থক হইয়াছে এরূপ মনে করিত। সুতরাং কুড়ার সম্বন্ধে মনে যাহাই থাক, ভগবানের দান বলিয়া স্বামী তাহাকে যখন তাহার কোলে ফেলিয়া দিল তখন কোন আপত্তি উঠাইতে তাহার আর শক্তি ছিল না। হাজার হোক্ নারীজাতি, এই অসহায় শিশুটির মুখখানি দেখিয়া তাহার অন্তরে যে একটুও অপত্য-স্নেহের উদয় হয় নাই একথাও জোর করিয়া বলা যায় না। সেই দিন হইতেই একদিকে কতকটা

অপত্যভাবের স্নেহ, অপরদিকে 'কোন্‌জাতের, কি ভাবের ছেলে কে জানে,' এই ভাবের কতকটা ঘৃণা-মিশ্রিত আক্রোশ যুগপৎ মনে উঠিয়া মধ্যে মধ্যে তাহাকে অস্থির করিয়া

তুলিত, সে তাহা প্রকাশ করিত না। শিশুটিকে বাঁচাইতে যে-টুকু প্রয়োজন ততটুকুই ছিল তাহার সঙ্গে সম্বন্ধ।

এক বৎসর পরে কুড়া আপনিই স্তন ছাড়িয়া দিল, হাঁটিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে সে যখন অন্দর ছাড়াইয়া বাহির বাটিতে আসিতে পারিল, তখন হইতেই সঙ্কীর্ণ লঘু অপত্য-স্নেহটুকু উবিয়া কুড়া সুলোচনার অন্তর হইতে বাহির হইয়া গেল।

এখন এইরূপে দুই তিন বৎসর পার হইয়া গেল। শিশু অবস্থায় কুড়ার প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য যাহা সকলের লক্ষ্যের বিষয় হইয়াছিল তাহা এই যে কুড়া নির্ভীক এবং

নিঃসঙ্কোচ গম্ভীর স্বভাবের, বেশী কথা তাহার মুখ হইতে বাহির হইত না। পরিবার-মধ্যে মেয়েদের কাছে সে ঘেঁসিত না, অন্দরে যাইতে সে যেন নারাজ—বাহিরে থাকিতেই তাহার ভাল লাগিত। বৃন্দাবনের পুত্র দুইটি, তাহারাও বেশ হৃষ্ট পুষ্ট, শ্যামবর্ণ। কুড়ার বর্ণ গৌর। কুড়াকে তাহারা দেখিতে পারিত না, মায়ের আক্রোশটুকু পুরামাত্রায় তাহারাই—বিশেষত বড়টি পাইয়াছিল। কুড়া কৌশলে তাহাদিগকে এড়াইয়া চলিত। তীক্ষ্ণধী বৃন্দাবন ইহা লক্ষ্য করিত।

তাহাকে কেহ ডাকিলে তবে যাইত, না হইলে যাইত না, কারো কাছে কিছু চাহিত না। সাহা-পরিবারের ছেলেদের সঙ্গে মানুষ হইলেও কুড়ার মধ্যে তাহাদের কোন প্রভাবই ছিলনা। তাহার উজ্জ্বল বড় বড় চক্ষু দেখিলেই তাহাকে সরল বুদ্ধিমান বলিয়া কাহারও বুঝিতে ভুল হইত না। কোমল শিশু, চাঁদের মত স্নিগ্ধ মুখখানি, মাথায় ঘন কালো চুলের শোভা, লোকের ভালবাসা আকর্ষণ করিত। অসাধারণ ধীশক্তি তাহার, যাহা দেখিত, শুনিত কখনও ভুলিয়া যাইত না। গানে তাহার বড়ই আসক্তি দেখা যাইত, আপন মনে—, আনন্দে সে আপনি গাহিত নাচিত। অতি মিষ্ট তার কণ্ঠ। যাত্রা কীর্ত্তনাদি শুনিয়া, সেইরূপ ভঙ্গি-সহকারে যে আবৃত্তি করিত তাহা দেখিয়া-শুনিয়া সকলে মুগ্ধ না হইয়া পারিত না। কুড়া সদানন্দ। যেন সকল সময়ে সে আপনাতেই আপনি মজিয়া থাকিত, ইহা লক্ষ্য করিয়া বৃন্দাবন তাহার প্রতি আন্তরিক একটা আকর্ষণ অনুভব করিত। আরও একটি কারণে বৃন্দাবনের অন্তরে কুড়ার উপর উচ্চ শ্রদ্ধার ভাব জন্মিয়াছিল। সেটি এই যে কুড়াকে আশ্রয়ে পাইবার পর হইতেই তাহার ব্যবসার বিস্তর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, আর্থিক সংস্থান বহু গুণে বাড়িয়াছিল। কুড়া তার নিজ ভাগ্যের সঙ্গে যেন জড়াইয়াছিল।

বৃন্দাবনের একটি প্রিয় এবং বিশ্বাসী ভৃত্য ছিল তাহার নাম ছিল বুদা। তাহার নিকট বৃন্দাবনের কিছুই গোপন ছিল না, নিজের বাক্স ও সিন্দুকের চাবি তাহার কাছেই থাকিত। সেও কুড়াকে বড়ই ভালবাসিত, কুড়াকে যত্ন করিত। কুড়া জানিত এ সংসারে কর্ত্তা বৃন্দাবন আর বুদাই তাহার বন্ধু আত্মীয় যাহা কিছু। সে বুদার বড়ই অনুগত, তাহারই পিছনে পিছনে চলিত, রাত্রে তাহার কাছেই শুইত। বুদারও কেমন একটা মায়া পড়িয়াছিল ঐ অনাথ শিশুটির উপর। রাত্রে শুইয়া কত কথা বুদার সঙ্গে কহিত।

এই ভাবে কুড়ার জীবনে পাঁচ ছয়টি বৎসর কাটিয়া যায়। এই সময় যেমন প্রতি বৎসর হইয়া থাকে, যথাকালে বৃন্দাবন সপরিবাবে নবদ্বীপে আসিল। ফাল্গুন মাসের প্রথমে দোলের সময় জনকোলাহল এবং উৎসব-মুখর নবদ্বীপে আসিয়া কুড়া আনন্দে মাতিয়া উঠিল।

দোলপূর্ণিমা হইয়া গেলে একদিন মহাপ্রভুর বাড়ীতে বড়ই ভীড়, বড় একদল কীর্ত্তনীয়া আসিয়াছে, সারা রাত্র কীর্ত্তন হইবে। বৃন্দাবন সপরিবারে সন্ধ্যার সময় আহারাদি সারিয়া মহাপ্রভুর মন্দিরে আসিয়াছে, কীর্ত্তন শুনিবে। সকলের মধ্যে কুড়াও আছে। গান সে বড় ভালবাসে, বিশেষতঃ কীর্ত্তন। পাছে ভীড়ের মধ্যে হারাইয়া যায় সেইজন্য বৃন্দাবন তাহার হাত ধরিয়া আছে। গোলমাল আর লোক-সমাগম খুব হইয়াছে, আরও হইতেছে। সকলেই মনোমত স্থান করিয়া লইতে ব্যস্ত। কাহারও অন্য কোনদিকে লক্ষ্য নাই, কিসে কীর্ত্তনীয়াদের কাছে বসিতে পারা যায় এই চেষ্টায় সকলেই বিব্রত।

কতক্ষণ পব কে জানে, হঠাৎ বৃন্দাবন দেখিল কুড়া হাত ধরিয়া নাই! সে, এদিক-ওদিক দেখিল, কৈ, তাকে তো দেখা যায় না। তারপর খোঁজাখুঁজিও, অনেকক্ষণ ধবিয়া দিকে দিকে অনেক হইল বটে, কিন্তু আশ্চর্য্য কথা,—কোথাও কুড়াকে পাওয়া গেল না।

অকস্মাৎ এই যে ব্যাপাবটা ঘটিয়া গেল ইহার জন্য বৃন্দাবন মনে আঘাত পাইল, এটা দৈব-ব্যাপার বলিয়াই তাহার মনে হইল,—কুড়া যেন ঠিক উবিয়া গেল। বুদাও কম বেদনা পাইল না—কারণ কুড়া এই দুইজনের হৃদয় সম্পূর্ণই অধিকার করিয়াছিল

৩

কুড়াব কি হইল, সে গেল কোথায়?—ভীড়ের মধ্যে পাঁচ বৎসবের দিগম্বর শিশু বৃন্দাবনের হাত ছাড়াইয়া গোলমাল ও ঠেলাঠেলির ভিতর দিয়া একেবারে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ওখানে তাহার বড়ই কষ্ট হইতেছিল। একে গরম- তার উপর মানুষের উপর মানুষ যেন চাপিয়া মারিতেছে, বাহিরে ফাঁকায় আসিয়া সে হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল। নিজের খেয়ালেই সে দূরে আরও ফাঁকায় যাইতে লাগিল। তাহার মনে হইল কীর্ত্তন আরম্ভ হইতে এখনও অনেক দেরী।

মেয়েপুরুষ ছোট ছোট ছেলে মেয়ে কোলে, আলোহাতে যাত্রীর সার চলিয়াছে, মহাপ্রভুর বাড়ীর দিকে। কতকক্ষণ চলিয়া সে অনেকটা ফাঁকায় দাঁড়াইল। তখনও অন্ধকার রহিয়াছে, চাঁদ উঠে নাই। দূরে দূরে এক একটি বাড়ীর আলো টিম্ টিম্

করিয়া জ্বলিতেছে। সে যে আপনার জন হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছে এ কথা যখন তাহার মনে পড়িল, তখনও তাহার ভয় হয় নাই। এখন অন্ধকার দেখিয়া দাঁড়াইয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল, তাহার গতি রুদ্ধ হইল, ফিরিয়া যাইতে এখন ইচ্ছা হইল। সে একটা ভিন্ন পথেই গিয়া পড়িয়াছিল, তাহার খেয়াল ছিল না। যে পথে আসিয়াছিল সেই পথে চলিতেছি মনে করিয়া পুনরায় সে চলিতে লাগিল। তখনও রাস্তায় লোক চলিতেছে, তাহাদের হাতে লণ্ঠন, তাহাতেই পথ আবছা দেখা যাইতেছে। ক্রমে সে দেখিল, লোকচলাচল তত ঘন নয়, দুইচারিজন একটু যেন তফাতে তফাতে চলিতেছে। সে একটি ছোট দলের সঙ্গ লইয়া তাহাদের পশ্চাতে চলিতে লাগিল। কুড়া ধরিয়া লইল ইহারা মহাপ্রভুর বাড়ীতে কীর্ত্তন শুনিতেই যাইতেছে। তাহারা চার পাঁচজন ছিল, আগে ও মাঝে যে ব্যক্তি, তাহাদের হাতে লণ্ঠন ছিল।

যাহাদের পশ্চাতে সে আসিতেছিল তাহারাও পিছন ফিরিয়া দেখে নাই, আর তাহারা মহাপ্রভুর বাড়ীতে কীর্ত্তন শুনিতেও যাইতেছিল না, তাহাদের গন্তব্য অন্য দিকে। ক্রমে কুড়া দেখিল যে তাহারা কয়জন একটা বিজন রাস্তায় আসিয়া পড়িল। তখন কুড়ার শিশুমনে যেন একটু সন্দেহ, এরা কি তবে কীর্ত্তন শুনিতে যাইতেছে না! সে বলিল, —তোমরা যাও কনে—কীর্ত্তনে যাবা না?

তাহাদের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক ছিল, ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কাদের ছেলে তুমি গো? কুড়া বলিল,—আমি কীর্ত্তনে যামু, তোমরা সেথা যাবা না? তখন যে পুরুষটি আগে ছিল সে ব্যক্তি দেখিল। দূরে তখন গাছপালার আড়ালে চাঁদ উঠিতেছে, পূর্ব্বাকাশে অন্ধকার তত নাই। সে-ব্যক্তি শিশু কুড়ানরামকে একবার ভাল করিয়া দেখিল, সুন্দর গৌরবর্ণ দিগম্বর শিশু। এমন সুন্দর ছেলেটিকে কোন্ হতভাগা ছাড়িয়া দিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল,—কাদের ছেলে তুমি? কুড়া কেবল মাত্র বলিল,—আমায় কর্ত্তার কাছে নিয়া চলেন। তাহারা বুঝিল এরা বিদেশী, পূর্ব্ববঙ্গের লোক হইবে—এ তাদেরই ছেলে। সে ব্যক্তি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে নারী-দুইটির মুখের দিকে চাহিল, কি যে তাহাদের মধ্যে কথা হইল কুড়া কিছুই বুঝিতে পারিলনা! শেষে সে ব্যক্তি বলিল—এসো তোমায় নিয়ে যাব সেখানে। বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া চলিতে লাগিল। ততক্ষণে চাঁদ উঠিয়াছে, আলো হইয়াছে, কুড়ার কোন ভয় হইল না। ক্রমে তাহারা গঙ্গার ধারে আসিয়া পৌঁছিল।

হরি যাকে রাখেন

অনেক নৌকা সারি সারি বাঁধা, নঙ্গর ফেলিয়া আছে। উনবিংশ শতাব্দির প্রথমার্দ্ধে নবদ্বীপের ঘাটে এত নৌকা থাকিত যে কেহ সংখ্যা গণনা করিতে পারিত না, এখন কেহ তাহার কল্পনাও করিতে পরিতে পারিবে না। যাহা হউক যে-খানাতে তাহারা উঠিল, সেখানা বেশ বড় নৌকা; অনেক মালপত্র তাহার মধ্যে। কুড়াকে কোলে লইয়া একজন ঘরের ভিতরে ভাল জায়গায় যেখানে বিছানা পাতা, সেখানে বসাইয়া দিল, এক কোণে দীপ জ্বলিতেছে।

কুড়া এইবার ভাল করিয়া তাহার দিকে দেখিল। সে ব্যক্তি জোয়ান দীর্ঘ চেহারা বড় বড় চক্ষু, বড় বড় বাবরী চুল, তাহার গোঁফ ছোট,—দাড়ি কামানো। তাহার মুখখানি কুড়ার ভাল লাগিল, যেন তাহার কাছে কোন ভয়ের কারণ নাই।

এখন ধীরে ধীরে কুড়া তাহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিল,—তাহাকে তাহারা কোথায় লইয়া যাইবে, কোথায় তাহাদের বাড়ীঘর, বুদা আছে কিনা? তাহারা কীর্ত্তন শুনিতে না গিয়া এখানে আসিল কেন,—তাহাকেই-বা আনিল কেন? এই সব। সে লোকটি কুড়াকে বুঝাইয়া দিল এই গঙ্গা দিয়া কেমন নৌকায় বসিয়া তাহারা যাইবে, কাল সকালে কেমন সুন্দর ফুলের বাগান দেখিতে পাইবে, সে লক্ষী ছেলেটির মত থাকিলে কাল তাহারা তাহাকে কর্ত্তার কাছে লইয়া যাইবে।

নৌকা প্রস্তুত ছিল, তাহার নিজের নৌকা, এখন মালিকের হুকুমে ছাড়িয়া দিল। মহাকৌতুহল কুড়াকে শান্ত করিয়া রাখিল। কুড়ার নানা স্থান দেখিবার কৌতূহল কম নয়। তাহা ছাড়া ভগবান তাহাকে একটি অপূর্ব্ব কল্যাণময় মনোভাব দিয়াছিলেন যে তাহার কেহই পর নয়। যাহার কাছে সে থাকে সে-ই তাহার আপনার, এইরূপ একটি ধারণা তাহাব মনের মধ্যে দৃঢ় হইয়া যায়। যাহাদের সঙ্গে কুড়া গেল তাহাকে বশ করিতে কোন বেগই তাহাদের পাইতে হইল না। এই ভাবে দুইটি দিন ও তিনটি রাত্র নৌকায় কাটাইয়া প্রাতে যখন তাহারা একটি প্রকাণ্ড সহরে পৌছিল, তখন কুড়া প্রায় তাহাদের আপন হইয়া গিয়াছে।

যে সময়ের কথা বলিতেছি তখনও ভারতের প্রায় সর্ব্বস্থানেই গোপনে গোপনে ছেলেমেয়ে চুরি এবং বিক্রয় চলিত। যাহারা কুড়াকে লইয়া গেল তাহাদের কি উদ্দেশ্য ছিল আমরা জানিনা, তবে তাহারা দেখিতে ভদ্র এবং কারবারী লোক, ব্যবহার ভাল—তাই সৎ বলিয়াই কুড়া তাহাদের বুঝিয়াছিল। তাহারা কুড়াকে যত্নেই রাখিয়াছিল।

নৌকা হইতেই তাহারা কুড়াকে পঞ্চু বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছিল; তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে কুড়া নামটি ভাল নয়, এবং পঞ্চু নামটি ভাল, ঠাকুরের নাম। কুড়া তাহাতে আপত্তি করিল না। গঙ্গার ধারে ছোট একটি বাগানওয়ালা একতলা পাকা বাড়িতেই তাহারা থাকিত। সেখানে তাহাদেরও একটি ছেলে ছিল—তাহার নাম বিধু। বিধুর সঙ্গে তাহার ভাব হইতে মোটেই দেরী হইল না। কুড়ার স্বভাবে তাহাদের প্রতি আনুগত্যের পরিচয় পাইয়া তাহারা কুড়ার উপর কঠিন নিয়ম কিছুই করে নাই। মধ্যে মধ্যে খেলায় মত্ত হইয়া কুড়া যদি একটু দূরে সরিয়া যাইত বাড়ীর কর্ত্তা তাহাকে সাবধান করিয়া দিতেন, ওদিকে ছেলেধরা আছে, নেংটা ছেলে দেখিলেই তাহাকে ধরিয়া ঝোলার মধ্যে পুরিয়া মুখ বন্ধ করিয়া লইয়া চলিয়া যাইবে। কুড়াকে আনিবার তিন চারি দিন পর বিধুর বাবা আবার কোথায় চলিয়া গেল, তখন সঙ্গে আর কেহ গেল না। প্রায় পনেরো কুড়ি দিন পরে আবার আসিল। কুড়া দেখিত, বিধুর বাপ এই ভাবে দুই চার দিন বাড়িতে থাকিয়া আবার কিছুদিনের জন্য চলিয়া যাইত।

এখানে বিধুর সঙ্গে ভাব হইবার পর আরও একটি সঙ্গিনী জুটিয়াছিল, তাহারা ঐ দেশেরই লোক। প্রায় ছয় বৎসরের একটি বালিকা, সে বিবাহিতা, তাহার নাম পার্ব্বতী। সে তাহাকে ভালবাসিত। গঙ্গার ধারে উচ্চ ভূমির উপর কুড়ারা তিনজনে মিলিয়া কত খেলাই করিত। কুড়া গান করিত, নাচিত, কত রকম আনন্দে তাহাদের সঙ্গে দিন কাটাইয়া দিত। পার্ব্বতীই তাহাকে জানাইয়াছিল যে এই স্থানের নাম ভাগলপুর। সে এখানকার অনেক কথাই জানে এখানে কোন্ পরবে ধুমধাম হয়, কত খেলনা আসে, কত কত বাজী হয়, কত খাবার দোকান বসে, কুড়াকে এই সব বলিত। কুড়া অবাক্ হইয়া পার্ব্বতীর কথা শুনিত।

৪

পার্ব্বতী খেলা করিতে কম সময়ই পাইত কারণ তাহারা গরীব লোক। এই অল্প বয়সেই পার্ব্বতীকে ঘরের কাজকর্ম্ম অনেক করিতে হইত। মধ্যে মধ্যে তাহার মা পার্ব্বতীর কাজে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহাকে কত তাড়না করিত, কুড়া তাহাতে ব্যথা পাইত। সে আশ্চর্য্য হইয়া যাইত, পার্ব্বতীকে একটা সংসারের কাজকর্ম্ম করিতে দেখিয়া। খেলা করিতে কম সময় পাইত বটে কিন্তু ঐ অল্প সময়ের মধ্যে সে এমন ভাবে আসিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দিত যে তাহার অভাব বোধ হইত না। এখানে বিধুদের

বাগানের ঠিক পাশেই পার্ব্বতীদের খোলার ঘর। কুড়া প্রথম হইতেই ঘরে থাকিতে নারাজ, সে বাড়ির বাহিরে বাহিরে থাকিতে,—সে বাহিরে থাকিতেই ভালবাসে, কখন

কুড়া সম্মুখেই দেখে এক ভীষণ মূর্ত্তি (পৃঃ ১৪)

কখন তাহাদের প্রস্তুত রুটি দাল খাইতে দিত, সেও আগ্রহ সহকারে খাইত। এই কখন কুড়া যাইয়া পার্ব্বতীদের ঘরে উপস্থিত। কুড়াকে তাহারাও যত্ন করিত। কখন

পার্ব্বতীর কথা কুড়াব পরবর্ত্তী জীবনেও আছে, কুড়া তাহাকে ভুলিতে পারে নাই। যাহা হউক, এইভাবে খেলা-ধূলায় এই নূতন স্থানে কুড়া সকলকে আপন করিয়া মনের আনন্দে বৎসরাধিক কাল কাটাইবার পর এক অদৃষ্টপূর্ব্ব ঘটনা তাহার জীবনে ঘটিয়া গেল।

একদিন সে সকালের দিকে গঙ্গাতীরে খেলা করিতে বাহির হইয়া কতক দূরে গিয়া

কোনো দিকে না চাহিয়া কুড়া দৌড় দিল (পৃঃ ১৪)

পড়িয়াছে। উলঙ্গ কুড়া কাপড় পরিতে বা রাখিতে পারিত না। তখনকার দিনে ঐ বয়সে শিশুদের কাপড় পরিয়া থাকার চলন ছিল না। ও দেশের ছেলেরা কৌপিন পরিত, কিন্তু কুড়ার কোমরে এক ঘুনসি, তাহাতে একটা মাদুলি ছাড়া কিছুই ছিল

না। তাহার কৌপিন পরিবার ইচ্ছাই হইত না। বিধুর মা তাহাকে অনুরোধ করিলে হাসিয়া বলিত,—"যখন সাধু হইয়া বার হব তখন পরমু।" আর তিনি পীড়াপিড়ি করিতেন না। যাহা হউক আজও সে দিগম্বর।

এখন সে আপন মনে কতকটা দূর আসিয়া গঙ্গার তীরে দাঁড়াইয়াছে, সুমুখেই দেখে এক ভীষণ মূর্ত্তি। দীর্ঘ জটাজুট, চক্ষু দু'টি ঘোর লাল, যেন জ্বলিতেছে, কপালে একটি বড় সিন্দুর-ফোঁটা, হাতে একখানা মড়ার মাথার খুলি তাহাতে কি যেন সব আছে, পরিধানে বাঘের ছাল ফেরতা দেওয়া,—দেখিয়াই কুড়া স্তম্ভিত হইল। কুড়াকে দেখিয়া তিনি নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন।

কুড়ার ভয় হইল, আর অগ্রসর না হইয়া দূর হইতে বলিল—কি করেন ?

কাপালিক বলিলেন,—তুমি আমার কাছে এসো তো বাপু, তুমি থাক কোথায় ?

কুড়ার আরও ভয় হইল। ইহার পূর্ব্বে এরূপ ভয় আর কোনও মানুষকে দেখিয়া তাহার কখনও হয় নাই। সে ভাবিল এই সেই ছেলে ধরা হইবে, বিধুর বাবা যাহার কথা বলিয়াছিল। আর সেখানে না দাঁড়াইয়া, কোনো দিকে না চাহিয়া কুড়া দৌড় দিল, একেবারে নিজস্থানে আসিয়া সে নিঃশ্বাস ফেলিল।

পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখে যে সেই ছেলেধরাও আসিতেছে, দেখিতে দেখিতে তিনি হনহন করিয়া আসিয়া পড়িলেন। বিধুর বাবা বাহিরেই ছিলেন, কুড়া কাতর নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া পশ্চাৎ দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া বলিল—"ঐ দেখেন কে আসে।"

কাপালিক আসিয়া তাহার সঙ্গে কথা আরম্ভ করিয়া দিলেন। কুড়া দূর হইতে ভয়ে ভয়ে দেখিতে লাগিল, কথা কিছুই শুনিতে পাইল না। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর কাপালিক চলিয়া গেলেন। তারপর বিধুর বাবা বাড়ীর ভিতরে আসিয়া কুড়াকে হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কি ঐ ভৈরব বাবার কাছে যাবে ?"

কুড়া বলিল—"না না আমি যাব না, ঐ ত ছেলেধরা, আপনি সেদিন কইছিলেন।"

সে বলিল,—"না না উনি ছেলেধরা হতে যাবেন কেন, উনি ত সাধু, বেশ ভাল লোক, উনি তোমায় ভালবাসবেন। কেমন কালী ঠাকুর দেখাবেন—বেশত তাঁর কাছে থাকবে।" কুড়া ঠাকুরের মধ্যে কালীমূর্ত্তি ভয়ের চক্ষেই দেখিত, সে তখন সজোরে মাথা নাড়িয়া না, না না, বলিয়া একেবারে মায়ের কাছে অন্দরে যাইয়া উপস্থিত হইল এবং সকল কথাই তাহাকে জানাইল। বিধুর মাকে কুড়াও মা বলিত। তিনিও

তাহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। এখন তিনি সস্নেহে কুড়াকে কাছে লইয়া বসিলেন। মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন,—"না, তুমি কেন যাবে তাঁর কাছে, আমার কাছেই থাকবে তুমি, কেমন ?" শুনিয়া কুড়া তখন প্রকৃতিস্থ হইল।

৩

কুড়া তাহার কাছে আশ্বাস পাইয়া তখন অনেকটা সুস্থ হইল বটে তবে আজ এ ভাবের অপ্রত্যাশিত একটা ভয়ের কারণে সারাদিন তাহার মনটা ভাল ছিল না। সে খেলায় মন লাগাইতে পারিল না। পার্ব্বতী ও বিধুর সঙ্গে যখন তাহার দেখা হইল তাহাদেরও সে সকল কথা বলিল। পার্ব্বতী শুনিয়া বলিল যে, ওরা রাক্ষস, ওরা দেবীর কাছে বলি দেয়, সেও তাহাকে অনেক বার দেখিয়াছে। কুড়া তাহার প্রত্যেকটি কথাই বিশ্বাস করিল। এই ভাবে কুড়া সমস্ত দিন কাটাইল—কাপালিকের রক্তবর্ণ প্রকাণ্ড চক্ষু দুটি মাঝে মাঝে তার মানস-চক্ষে দেখা দিতে লাগিল। রাত্রে আহারাদির পর শুইয়া সে কত কি ভাবিতে লাগিল।

ভিতরে একখানি বড় ঘরে তাহারা শুইত। বিধুর মা ও বাপ একখানি বড় খাটে, আর বিধু ও কুড়া একখানা ছোট তক্তার উপর বিছানায় শুইত। আজ রাত্রে অনেকক্ষণ তাহার ঘুম আসে নাই। ইতিমধ্যে কর্ত্তা-গিন্নি শুইবার পর তাহাদের মধ্যে যে কথা হইতেছিল তাহা কুড়ার কানে গেল। তাহাদের কথা শুনিয়া সে সকল ব্যাপার ভাল বুঝিল না, তবে এটুকু বেশ বুঝিতে পারিল যে, কথাটা তাহার সম্বন্ধেই হইতেছে আর তাহাকে কর্ত্তা, কিছু টাকা লইয়া কাপালিকের কাছে বিক্রয় করিতেছে। বিধুর মা তাহাতে রাজী নয়, দুজনে অনেক বাদ প্রতিবাদ হইল, কিন্তু শেষ অবধি কি ব্যাপার দাঁড়াইল তাহা সে ভাল বুঝিতে পারিল না। এই সব নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে সে তারপর ঘুমাইয়া পড়িল।

ক্রমে দুই চার দিনের মধ্যে, খেলায়-ধুলায় কুড়া ও সকল ব্যাপার এক প্রকার ভুলিয়া গেল। তাহার প্রায় আট দশ দিন পরে এক সকালে আবার সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি কাপালিক আসিয়া উপস্থিত। বিধুর বাবা এই কয় দিন আর কোথাও যায় নাই, ঘরেই আছে। কাপালিক তাহার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়া চলিয়া গেলেন। কুড়া তাহাকে দেখিয়া ভয়ে ভয়ে দূরেই ছিল, সুতরাং তাহাদের কোন কথাই শুনিতে পায় নাই, তবে তাহার মন আবার একটা ভয়ের আভাস পাইয়া অস্থির হইয়া উঠিল। সেটা আরও বাড়িয়া গেল যখন বৈকালে বিধুর বাবা তাহাকে বলিল—"চল, আজ তোমায় এক জায়গায় ঠাকুর দেখিয়ে আনি।"

হরি যাকে রাখেন

শুনিয়া কুড়ার প্রাণের মধ্যে এবার একটা আতঙ্কে হৃদয়টি ছায়া স্পষ্ট রূপে নির্ম্মল সদানন্দ ঢাকিয়া ফেলিল, সে বলিল,—"বিধু যাবে না ?"

বিধুর বাবা কখনও তাহাকে এমন করিয়া বেড়াইতে লইয়া যায় নাই, সেই কারণে আরও তাহার মনে একটা সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইল, বিধুর কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কাতর নয়নে সে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

তাহার কথার উত্তরে বিধুর বাবা একটু কঠিন হইয়া বলিল,—"না সে যাবেনা," নিরুপায় কুড়া তবুও বলিল,—"মাকে বলে আসি ?"

বিধুর মাকে সে মা বলিত, কর্ত্তা জানিত কুড়াব উপর তাহার স্ত্রীর স্নেহ আছে। বেগতিক দেখিয়া তখন কর্ত্তা কুড়াব হাতখানি ধরিয়া জোর কবিয়া টানিয়া আনিতে আনিতে বলিল,—"বাড়ীর ভিতরে যাবাব কি দরকার ? আর মায়ের কাছে অনুমতি নিতে হবে না।"

এরূপ ব্যবহার বিধুর বাপের কাছে কুড়া আগে কখনও পায় নাই। তাই প্রথমে একটা বিস্ময়, সেই সঙ্গে আসিল এক আতঙ্ক, শেষে কৌতূহলই তাহাকে স্থির রাখিল।

পথে আনিয়া কর্ত্তা তাহাকে নানা কথায় ভুলাইতে ভুলাইতে লইয়া চলিল। গঙ্গার ধারে ধারেই তাহারা চলিয়াছে। প্রায় মাইল দুই আসিয়া খুব উঁচু একটা জমির নিকটে কর্ত্তা দাঁড়াইল। সেথায় গাছপালার ঢাকা একটি বড় ঘর, তাহার পশ্চাতে একটি জীর্ণ মন্দির ফাটিয়া তাহার উপর বড় বড় অশ্বত্থ গাছ বাহির হইয়াছে। কুড়া আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, তাহারা দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতেই কপালে সিন্দুরেব ফোঁটা, লাল কাপড়পরা, একটা রোগা লোক বাহিরে আসিল আর ইঙ্গিতে বিধুর বাবাকে ডাকিয়া সঙ্গে করিয়া ভিতরে কুটিরের দিকে লইয়া গেল।

স্থানটি ঘন গাছপালায় যেন অন্ধকার হইয়া আছে। একটা বড় পাশের ঘরের দাওয়ায় তাহারা দেখিল একখানা প্রকাণ্ড গুল বাঘের ছাল পাতা রহিয়াছে। তাহার উপর সেই ভৈরব উলঙ্গ বসিয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিয়া কুড়া ভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিল,—"আমি এখানে রইমু না কর্ত্তা, ঘরে নিয়া চলেন।" পার্ব্বতীর কথা তাহার মনে পড়িল, ওরা রাক্ষস, মানুষকে দেবীর কাছে বলি দেয়। কাপালিক তখন তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে একবার কুড়ার দিকে চাহিলেন। কুড়া তাহার মধ্যে কি দেখিল তা সেই জানে

পার্ব্বতী শুনিয়া বলিল যে, ওরা যাচ্ছেন, —১৫ পৃষ্ঠা

লাসার মঠ

—৭৬ পৃষ্ঠা

আর তাহার মুখে কোন কথাই ফুটিল না। নিকটে আনা হইলে ভৈরব তাহাকে বলিলেন,—এইখানে বোস্। কথা শুনিবামাত্র কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া কুড়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল। বসিয়া বসিয়া যেন ঘুম আসিতেছিল, সে আগে-পাছে দুলিতে লাগিল। তারপর এইভাবে দুলিতে দুলিতে কখন সে একেবারেই সেইখানে ঘুমাইয়া পড়িল;—তাহার কিছুই মনে রহিল না।

যখন জ্ঞান হইল, কুড়া দেখিল, ঘোর অন্ধকার, চারিদিক নিস্তব্ধ, যেন গভীর রাত্রি। সুমুখে ঘরের মধ্যে পূজার আয়োজন, এক কোণে একটি প্রদীপ, বেশ উজ্জ্বল তার শিখা, জ্বলিতেছে—তাহাতেই যা দেখা যাইতেছে। পাশের দিকে চোখ পড়িতেই সে চমকিয়া উঠিল; এ যে সেই উলঙ্গ কাপালিক—দাঁড়াইয়া, লণ্ঠন হাতে, কাঁধে গামছা, তারই দিকে চাহিয়া আছেন। আঁধারে আলোয় তাঁর মূর্ত্তি বড় ভয়ঙ্কর দেখাইতেছে।

উঠে বোস্,—বলিতেই কুড়া যন্ত্রবৎ উঠিয়া বসিল। আর তাহার প্রাণে ভয় নাই, দুঃখ নাই, সুখ নাই, কোন প্রকার বোধ আছে কিনা সন্দেহ।

ঘরের ভিতর কাহাকে উদ্দেশ করিয়া কাপালিক ডাকিলেন,—অনাদি!

সে ব্যক্তি বাহিরে আসিলে তিনি বলিলেন,—আমি স্নান করে আসি আর একেও নিয়ে যাই। আলোটাও নিয়ে যাব; তুমি সব ঠিক করে রাখ।

পরে কুড়ার দিকে ফিরিয়া,—চলে আয়, বলিয়া তাহার কোমল হাতটি ধরিয়া অগ্রসর হইলেন। কতকটা জঙ্গল পার হইয়া ফাঁকায় পড়িলে লণ্ঠনের আলোয় কুড়া দেখিল একটি শেয়াল,—আলো দেখিয়া ধীরে ধীরে যেন তাহারই দিকে দেখিতে দেখিতে গাছপালার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কাপালিক বলিলেন,—যা বাবা যা, এখন নয় পরে আসবি। আজ তোর জন্যে মা ভাল ভোগেরই ব্যবস্থা করেছেন।

ক্রমে তাহারা গঙ্গা তীরে আসিয়া পড়িল। জলের ধারে আসিয়া কাপালিক আলোটা নামাইয়া রাখিলেন, তারপর এক কোশ গঙ্গা জল তুলিয়া লইয়া মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে কুড়ার মাথায় ও সর্ব্বাঙ্গে ছিটাইয়া দিলেন। সিঞ্চনের সঙ্গে সঙ্গেই সে একবার কাঁপিয়া উঠিল—তারপর আবার পূর্ব্ববৎ স্থির হইয়া দাঁড়াইল। এইবার কাপালিক অস্পষ্ট ভাবে মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে তাহার হাত ধরিয়া জলে নামিয়া পড়িলেন।

উঁচু-নীচু রকমের একটা কিছু ছিল বোধ হয়, অথবা অন্য কিছু হইবে, তখন বুঝা গেল না,—জলের মধ্যে দুই এক পা যাইয়া হঠাৎ কাঁপিতে কাঁপিতে কাপালিক যেন পিছলাইয়া কতকটা বেশী জলে পড়িয়া গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে যে হাতে কুড়াকে ধরিয়াছিলেন সে মুষ্টিও একেবারে শিথিল হইয়া পড়িল। তারপর তাঁহার মুখ হইতে কেবল গোঁ গোঁ আওয়াজ বাহির হইতে লাগিল। কুড়াও ধাক্কা সামলাইতে পারিল না, পড়িয়া গেল বটে কিন্তু আবার উঠিয়া দাঁড়াইল।

কাপালিক যেন কথা কহিতে চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু কোন কথাই স্পষ্ট বাহির হইতেছে না। কুড়া ঠিক সেইখানেই দাঁড়াইয়া আছে, দেখিতেছে বটে, কিন্তু কি মনে করিতেছে কে জানে! কেবল সে তাঁহার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া আছে।

কাপালিক যেন উঠিবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতেছেন। অনেক চেষ্টাই করিতেছেন, কিন্তু সকল প্রয়াস বিফল হইতেছে,—তিনি ক্রমশঃ একদিকে কাৎ হইয়া যেন এলাইয়া পড়িতেছেন বোধ হইল। একটা হাত কেবল তুলিতেছেন আর এক পা দিয়া জলের ভিতর হইতে উঠিয়া ডাঙার দিকে আসিবার জন্য হাঁকু-পাকু করিতেছেন,—কিন্তু কিছুতেই উঠিতে বা একটু সরিতেও পারিতেছেন না। তাঁহার এ কি হইল?

৬

ক্রমে কুড়ার মধ্যে আবেশ কাটিবার লক্ষণ দেখা গেল;—প্রাকৃতিক নিয়মে, এই ব্যাপারটাই যেন তাহার সেই মোহাচ্ছন্ন ভাব কাটাইয়া তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া দিল। ছয় সাত বৎসরের নিরীহ শিশু, তাহাকে বালক বলাও চলে না। তাহার উপর আভিচারিক শক্তির প্রভাব,—কাজেই সহজ অবস্থায় ব্যাপারটা তাহার অনুভবের বিষয় করিয়া লইতে কতকটা সময় গেল। যখন সে তাহার সহজ দৃষ্টি পাইল—আসন্ন বিপদ বুঝিয়াও চঞ্চল হইল না। এ অবস্থায় সে কি করিতে পারে তাহাই যেন একটু ভাবিয়া লইল,—দুই এক পা অগ্রসর হইয়া নিজেকে সামলাইয়া অল্প জলে গিয়া দাঁড়াইল। তারপর সেই নির্ম্মলচিত্ত, দেবশিশু,—যে হাতটি কাপালিক ঘন ঘন তুলিতেছিলেন সেই হাতটি নিজের দুই হাত দিয়া ধরিল, এবং যথাসাধ্য জোরে ডাঙার দিকে টানিতে লাগিল।

তাহার শক্তি কতটুকু? কাপালিকের প্রকাণ্ড শরীর;—সেই হাতীকে, টানিয়া তোলা তো দূরের কথা. একটু নড়াইতেও তাহার সাধ্য ছিল না। যখন সে বুঝিল তাহার

বল, তাহার ক্ষুদ্র শরীরের এইটুকু শক্তি, এ ক্ষেত্রে কোন কাজেই আসিবে না—তখন অসহায়, ব্যাকুল নয়নে সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

অমানিশার ঘোর অন্ধকারে চারিদিক ঢাকিয়াছে। সামান্য সেই লণ্ঠনের আলোটুকুতে যেন সেই অন্ধকাব আরও ভয়ঙ্কর দেখাইতেছে। আকাশে অগণিত উজ্জ্বল দীপ্তিমান চক্ষু যেন তাহাব দিকেই দেখিতেছে। তাহার কিছুমাত্র ভয় নাই।

একটু তফাতে কয়েকখানা নৌকা রহিয়াছে, অস্পষ্ট, আবছা দেখা যাইতেছে—কিন্তু সে কি করিয়া জানাইবে যে এখানে তাহাদেব সাহায্য প্রয়োজন। আসলে কিছুই কবা গেল না। এইভাবে কতক্ষণ গেল। বোধ করি তাহাদের ফিরিতে অত্যধিক বিলম্ব দেখিয়াই অনাদি সেখানে উপস্থিত হইল।

সুমুখে যে ব্যাপার দেখিল, তাহাতে প্রথমটা সে কিছুই বুঝিতে পারিল না বটে তবে, একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাহার বুক ঢুরু ঢুরু কাঁপিয়া উঠিল।

অনাদিকে দেখিয়া কাপালিক ঘন ঘন হাত তুলিয়া কত কি বলিতে লাগিলেন, কিন্তু অনাদি, এক টানা গোঁঙানি ছাড়া তাহার আর কোন মর্ম্মই বুঝিতে পারিল না। অবশেষে সে মহা উদ্বেগ ও ভয়ে কাতর হইয়া কুড়াকে জিজ্ঞাসা করিল,—কি হয়েচে বলত, বাবা?

কুড়া কেবল মাত্র বলিল,—পড়ে গেছেন দেখি জলের মইধ্যে। ইহার বেশী আর সে কি জানে। অনাদির মুখের দিকে চাহিয়া সে আবার বলিল,—ইঁয়ারে তুলেন!

অনাদি হতভম্ব অবস্থায় কতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল,—তারপব এখন কুড়ার মুখে ইঁহাকে তুলিবার কথা যখন তাব কানে গেল, তখন সে বুঝিল ইঁহাকে জল হইতে উঠানোই আশু প্রয়োজন। কিন্তু সেও তো বিশেষ বলবান নয়, ক্ষীণ শরীর তাহার,—অথচ অন্য উপায়ও ত কিছু হাতেব কাছে নাই। কাজেই সে কোমর বাঁধিয়া জলে নামিল এবং অনেক কষ্টে, টানিয়া হিঁচড়াইয়া কোন প্রকারে সেই দেহখানি ডাঙায় উঠাইল বটে,—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কাপালিকের সেই বিপুল শরীর একেবারেই এলাইয়া পড়িল।

শরীরের একটা দিক্ একেবারে পড়িয়া গিয়াছে দেখিয়া অনাদি বুঝিল, এটা পক্ষাঘাত। প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে সামান্যভাবে একবার ইহার আক্রমণ হইয়াছিল তাহা সে জানিত, এবারে সাংঘাতিক হইয়াছে। অনাদি বুঝিল, ইঁহাকে আর উঠিতে হইবে না।

এমন স্থানে কে জানে হঠাৎ এই ব্যাপার ঘটিবে! ইহা স্বপনেরও অগোচর।

এখানে এমন কেহ নাই যাহার সাহায্যে কাপালিককে আশ্রমে আনা যায়। আজ তাঁর সিদ্ধির মহাযজ্ঞ,—আয়োজনও সব ঠিক, কিন্তু এ কি হইল ? দেবী বিরূপ হইলেন কেন ? নিশ্চয়ই কিছু অপরাধ হইয়া থাকিবে। তাহার মনে হইল, দেবী কুপিত হইয়াছেন। মনে হইল কাপালিকের প্রাণ যখন এখনও আছে তখন চিকিৎসা চলিতে পারে। কিন্তু কি করিয়া তাঁহাকে আশ্রমে লইয়া যাইবে ইহাই হইল সমস্যা। কিছু দূরে কয়েকখানি নৌকা দেখা যাইতেছিল, তাহারা সব আলো নিবাইয়া বহুক্ষণ শুইয়াছে। অনাদি মাঝি-মাল্লাদের ডাকিবে কিনা একবার ভাবিয়া লইল, শেষে কি মনে করিয়া নিরস্ত হইল।

কাপালিকের এখন আর কোন অঙ্গই নড়িতেছে না, তাঁর সর্ব্বাঙ্গ নিস্তেজ স্তব্ধ স্থির। আলোটা তুলিয়া অনাদি একবার সেই ধরাশায়ী মূর্ত্তির মুখের উপর ফেলিল, দেখিল দেহ স্থির অবশ বটে, চক্ষু দুটি কিন্তু এখনও জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। তাহাতে অস্বাভাবিক একটা দীপ্তি দেখিয়া ভয়ে অনাদির গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল, সে দুই পা হটিয়া আসিল। এবার সে মনে মনে যেন কাপালিকের মৃত্যু কামনাই করিল।

তারপর, কি যেন একটা সঙ্কল্প তখনই মনে মনে সে করিয়া ফেলিল,—তার অল্পক্ষণ পরেই একহাতে আলো লইয়া অনাদি, কুড়ার একখানি হাত সযত্নে ধরিয়া কহিল,—চল বাবা,—আমরা যাই।

এখন কুড়ার ঘোর সম্পূর্ণই কাটিয়া গিয়াছে। সে বলিল,—ইনি হেথা পড়ে থাকবেন ?

অনাদি বলিল,—উনি আর বাঁচবেন না, কে এখন ওঁকে ঘরে নিয়ে যাবে। চলো আমরা যাই, ওখানে গিয়ে দেখি কি হয়।

তাহারা চলিয়া গেল। নির্জ্জীব কাপালিক একা অন্ধকারে নদীতীরে পড়িয়া রহিলেন। আজ তাঁর জীবনে সম্যক্ পুরুষার্থ সাফল্যের দিন,—বোধ হয় কয়দণ্ড আগেও তিনি সিদ্ধিকে করতলগতই ভাবিয়াছিলেন।

৭

আশ্রমে আসিয়া অনাদি কুড়াকে বসাইয়া প্রথমে যন্ত্রপূজা করিল, তারপর কিছুক্ষণ ধ্যানে রহিল। শেষে যাহা কিছু ভোগের আয়োজন সবই ইষ্ট দেবীকে নিবেদন করিয়া দিল। যত শীঘ্র সম্ভব কাজ সারিয়া সে অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিল। কত কি সব বলিতে লাগিল, কুড়া তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না। পরে সে উঠিয়া কুড়াকে বলিল,—তুমি আমার সঙ্গে এসে আলোটা একবার ধর দিকি, বাবা।

নির্জ্জন আশ্রমে, পূজার ঘরের মধ্যে আমকাঠের একটা বিশালকায় সিন্দুক ছিল। সিকায় ঝাঁপির মধ্যে হাত গলাইয়া অনাদি এক প্রকাণ্ড চাবি বাহির করিল। সিন্দুকের উপর অনেক কিছু রাখা ছিল, ক্ষিপ্রহস্তে সে সকল নীচে ফেলিয়া প্রকাণ্ড তালাটা খুলিয়া

ফেলিল। তারপর কুড়াকে আলো হাতে একটা চৌকীর উপর দাঁড় করাইয়া সে আপন কাজে মনোনিবেশ করিল। আলো হাতে কুড়া বিস্মিত চক্ষে তাহার কাণ্ড দেখিতে লাগিল।

ডালা খুলিতেই প্রথমে লাল কাপড়ে জড়ানো কতকগুলি পুঁথিপত্র দেখা গেল। তার নীচে রেশমের কতকগুলি মূল্যবান বস্ত্র রাখা ছিল। সে সকল সরানো হইলে দেখা গেল, বড় বড় পিতলের কলস, দশ বারোটি সারি সারি রাখা আছে। প্রত্যেকটির মুখ বাটী দিয়া ঢাকা, তার উপর কাপড়জড়ানো, উপরে গাঁট বাঁধা।

একটির মুখ খুলিয়া, অনাদিকালের সঞ্চিত ভোগ-আকাঙ্ক্ষা-লোলুপ চক্ষুদুটি বিস্ফারিত করিয়া অনাদি দেখিল,—চকচকে সোনার মোহরে গলা অবধি পূর্ণ। অনেকক্ষণই সে একদৃষ্টে সে-দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর হাতে কয়েকটা উঠাইয়া দীপালোকে ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহার দেহ নৃত্যশীল হইয়া উঠিল,—কিন্তু সে সংযত হইল। দেখা শেষ হইলে উহা পূর্ব্ববৎ বন্ধ করিয়া রাখিল। সিন্দুকের এক কোণে একটা পুলিন্দা, লাল চেলীর কাপড়ে বাঁধা। কাপড়খানি খুলিলে দেখা গেল একটি পেটিকা লক্ষ্মীর চুবড়ীর মত, উপরে চূড়াওয়ালা ঢাকা, এক দিকে একটি রেশমী গাঁট-বাঁধা। এখন থাক,—বলিয়া, সে যথাস্থানে সেটা রাখিয়া দিল। চারিদিকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া, যখন দেখিল আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না, তখন সে কাপড়চোপড় পুঁথিপত্র প্রভৃতি যেমন ছিল তেমনই রাখিয়া দিল। সিন্দুকের ডালা বন্ধ করিয়া তালাও লাগাইল। তারপর ঝটিতি আলোটা কুড়ার হাত হইতে লইয়া মাটিতে রাখিয়া দিল এবং তাহাকে কোলে লইয়া সস্নেহে তার কপালে চুম্বন করিয়া বলিল,—বাবা, মা জগদম্বাই আজ তোমায় বাঁচিয়েছেন, না হলে আজ আর তোমার রক্ষা ছিল না। তোমার খিদে পেয়েছে, না?

কুড়া ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া বলিল যে তাহার তৃষ্ণা পাইয়াছে। সে একটু জল চায়। চল বাবা তোমায় খেতে দিই,—বলিয়া শুধু কুড়া নয় সে নিজেও খাইতে বসিয়া গেল।

প্রথমেই কলস হইতে ঢালিয়া কারণ বারি দুই তিন পাত্র পান করিয়া লইল, পরে মহানন্দে ভোজন আরম্ভ করিল। তাহার আনন্দের আর সীমা-পরিসীমা রহিল না। পর্য্যাপ্ত ভোজ্য সামগ্রী সঞ্চিত ছিল,—আনন্দের আতিশয্যে, আগে শিবা-ভোগের ব্যবস্থার কথা সে একেবারেই ভুলিয়া গেল। আহার শেষ হইলে তাহার শিবাভোগের কথা যখন স্মরণে আসিল—তখন অবশিষ্ট অংশ শিবা-ভোগে লাগানো হইল। তারপর অনাদি কুড়াকে কোলে লইয়া গান করিতে করিতে নাচিতে লাগিল। গানগুলি অবশ্য মায়েরই

নাম। অনাদি যেন বেশ বুঝিতে পারিল আজ এই যে আনন্দ ও সম্পদ সে পাইল তার মূল এই শিশুটি, এর জন্যই আজ তাহার এতটা সুখের কারণ ঘটিয়াছে। সে আরও বুঝিল, শিশুটি দৈব-রক্ষিত,—না হইলে এমন অঘটন কখনও কি ঘটে ?

যাহা হউক কুড়ার ঘুম আসিয়াছে দেখিয়া সে তাহাকে কাপালিকের শয্যায় শয়ন করাইয়া দিল, বলিল,—তুমি ঘুমোও বাবা, কিছু ভয় নেই. আমি এইখানেই তোমার কাছে রইলাম। অনাদি সারা রাত্র ঘুমাইল না,—রাতও আর বড় বেশীক্ষণ ছিল না, আর তাহার চক্ষে ঘুমও ছিল না

পরদিন সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গিল কুড়া ঘরের মধ্যে কাহাকেও দেখিতে পাইল না, সেখানে অনাদি নাই। বাহিরে আসিয়া সে চারিদিক দেখিল,—সোনার রৌদ্রে দিক্‌মণ্ডল ভাসিতেছে। চারিদিকেই যেন আনন্দের খেলা, মুক্তির আনন্দে সে ছুটিয়া আশ্রম হইতে বাহিরে আসিল। বাতাসে একটা সুগন্ধ, আকাশে যেন আনন্দের বিজলী খেলিতেছে। সে গঙ্গার দিকে ছুটিতে লাগিল, কতকটা আসিয়া দেখিল—অনাদি,—দশ বারো জন লোক লইয়া সেই দিকেই আসিতেছে। দেখামাত্র অনাদি বলিল—গঙ্গার ধারে এখন যেওনা বাবা, ওখানে খুব ভিড়, তিনি মরে গেছেন।

ইহাতে নিরুৎসাহ না হইয়া কুড়া বলিল,—আমি যাবো, দেখবো, তিনি আছেন কোথা ? বলিতে বলিতে কুড়া দৌড় দিল। তাহার আর ভয় নাই, উদ্দাম কৌতূহলই তাহাকে এখন চালাইতেছিল। অনাদি লোকজন লইয়া আশ্রমের দিকে গেল, কুড়ার দিকে আর ফিরিয়াও দেখিল না।

গঙ্গাতীরে কুড়া যে দৃশ্য আজ দেখিল তাহা আর কখনও ভুলিতে পারিল না। এখানে, এই বয়সেই তাহার ভবিষ্যৎ জীবনটি যেন নিয়ন্ত্রিত হইয়া গেল।

সে দেখিল, অনেকগুলি লোক চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ক্ষিপ্রপদে কুড়া লোকের ফাঁকে ফাঁকে ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। দেখিল, উলঙ্গ কাপালিকের বিশাল শরীর পড়িয়া। প্রাণহীন, নিস্পন্দ মৃতদেহ, কিন্তু চক্ষু দুটি যেন এখনও জীবন্ত, উপর দিকে খরদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। পাহাড়ের মত প্রকাণ্ড শরীর, আজ আর তাহা দেখিয়া কুড়ার ভয় হইল না। কিন্তু পা হইতে মুখ অবধি শরীরের স্থানে স্থানে শৃগাল কুকুরে ছিঁড়িয়া খাইয়াছে। তাহাতে যে ভয়ঙ্কর দৃশ্য হইয়াছে তাহা দাঁড়াইয়া দেখা কুড়ার মত ছোট্ট মানুষটির পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু কুড়া পাথরের মত নিশ্চল, স্থির,

অপলক নেত্রে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। কি যে দেখিল, কি ভাবিল, কি বা বুঝিল তা সেই-ই জানে। কত লোক আসিল, গেল—কুড়ার ভ্রুক্ষেপ নাই, ঠিক দাঁড়াইয়া আছে।

৮

নৌকা-ঘাটায় দুই তিন খানি নৌকা ছিল, তাধ পাশে যাত্রী লইয়া দু'খানা পলোয়ার এখন আসিয়া লাগিল। বড় নৌকা, ভিতরে অনেক লোক, মালামালও বহুবিধ। এখন তীরে ভিড়িবামাত্র নামিবার ধুম পড়িয়া গেল। যাহারা নামিল, সুমুখে এতটা ভিড় দেখিয়া তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া বাহির হইতে ব্যাপার কি একটু কেখিতে চেষ্টা করিল কিন্তু সুবিধা হইল না, কাজেই একটু পরিশ্রম করিয়া তাহাকে ভিতরে ঢুকিতে হইল। কিন্তু যে দৃশ্য দেখিতে হইল তাহা এমনই ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ চিন্তার অতীত ব্যাপার—বোধহয় কেহ কখনও এমন দেখে নাই। সে ব্যক্তি আর দেখিতে চাহিল না, প্রাণ তাহার চঞ্চল হইয়া উঠিল। তখন বাহির হইবার চেষ্টায় পাশ ফিরিয়া এদিক-ওদিক দেখিতে হঠাৎ উলঙ্গ কুড়ার দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িয়া গেল। তাড়াতাড়ি কয়েক জনকে অতিক্রম করিয়া সে ব্যক্তি একান্তই তন্ময় মূর্ত্তি—কুড়ার একেবারে পাশে আসিয়া দাঁড়াইল এবং একটু ঝুঁকিয়া তাহার মুখখানি একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইল;—তারপর ডাকিল—কুড়া! কুড়ার ধ্যান ভঙ্গ হইল, চমকিত কুড়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল। স্মৃতি তাহার সহায় হইল। যখন সে নিশ্চিত হইল যে ঢাকার বৃন্দাবন সাহা, তাহার কর্ত্তা, পালক পিতাকেই দেখিতেছে তখন ঝাঁপাইয়া সে তাহার কোলের উপর উঠিয়া কাঁধে মুখ লুকাইল।

সপরিবারে বৃন্দাবন তীর্থ-যাত্রায় বাহির হইয়াছে। আজ তাহারা স্নানাহার সারিতে সবেমাত্র এইখানে পৌছিয়াছে। এরূপ অভাবনীয় ঘটনার মধ্যে কুড়াকে পাইয়া বৃন্দাবন আনন্দে একেবারে আত্মহারা হইল। কুড়াকে কোলে লইয়া বৃন্দাবন তৎক্ষণাৎ নৌকায় লইয়া গেল। সকলে কুড়াকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল, কেবল গৃহিণীর ভাবান্তর হইল। আপদটা এতকাল ছিল না, তিনি বেশ ছিলেন।

যাহা হউক কুড়াকে বৃন্দাবন কোলে লইয়া বসিলে আর আর সকলে ঘিরিয়া বসিল, তারপর তাহার প্রতি প্রশ্নের পর প্রশ্ন হইতে লাগিল।

এখন কুড়ার কথা ফুটিয়াছে। সে তখন, নবদ্বীপ মহাপ্রভুর বাড়ী হইতে বাহিরে আসা. তারপর সে রাত্রের ঘটনা হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর যাহা কিছু আজ পর্য্যন্ত

ঘটিয়াছে আনুপূর্ব্বিক সকল কথাই স্পষ্ট করিয়া এমন গুছাইয়া বলিতে লাগিল, শুনিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল। সাত বৎসরের কুড়া তাহার মধ্যে যেন ষোড়শ বর্ষীয় বালকের অভিজ্ঞতা, মুখে তাহার প্রতিভার দীপ্তি—স্পষ্ট হইয়া উঠিল। এখানে বিধুর বাপ তাহাকে ছেলে-ধরার কাছে টাকা লইয়া বিক্রি করার কথা যেমনটি শুনিয়াছিল, বলিল। তারপর কাল বিকালে কাপালিকের কাছে আনা, তারপর তাঁহার দৃষ্টিপাতে অজ্ঞান হইয়া যাওয়া, —রাত্রে গঙ্গাতীরে যাহা ঘটিয়াছিল, কাপালিকের পড়িয়া যাওয়া, তাঁহাকে নদীতীরে ফেলিয়া অনাদির কুড়াকে লইয়া আশ্রমে আসা, তারপর যে যে কাণ্ড ঘটিয়াছে, অনাদির যন্ত্র পূজা, সিন্দুক খোলা, তাহার আলো ধরিয়া দাঁড়ানো, ঘড়া ঘড়া মোহর, তাহাকে কোলে লইয়া অনাদির নাচ, সকল ব্যাপার তাহার কথায় ছবির মত স্পষ্ট ও পরিষ্কার সকলের কাছে ধরিয়া দিল। এমন আশ্চর্য্য কাহিনী তাহারা পূর্ব্বে কেহ কখনও শুনে নাই, তাহাদের বিস্ময়ের অন্ত রহিল না।

যাহারা কুড়াকে ভুলাইয়া আনিয়া ছিল, বৃন্দাবন মনে করিলে তাহাদের সন্ধান করিয়া বিশেষ দণ্ডের ব্যবস্থা করিতে পারিত কিন্তু সে তাহা করিল না। তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়া পথে অপ্রত্যাশিত ভাবে, অক্ষতদেহে কুড়াকে পাইয়া মনে মনে ভাবিল, যিনি সকলের দণ্ডদাতা তিনিই ইহার দণ্ড দিবেন। তারপর কাপালিকের পরিণামের কথা ভাবিয়া আরও তাঁহার এ সকল ব্যাপার লইয়া সাধারণ ভাবে একটা আন্দোলন করিতে প্রাণ চাহিল না। ভগবানের দণ্ড কে এড়াইতে পারে? তাঁর তুল্য যথোচিত দণ্ডই বা মানুষে কেমন করিয়া দিবে? মানুষের বিচার কত না সঙ্কীর্ণ। কুড়াকে পাইয়াছেন, এখন এইটিই তার পরম লাভ। তাহা ছাড়া কুড়া যে দৈব-রক্ষিত এ কথা পূর্ব্বে তাহার জানা থাকিলেও এখন অন্তরে তাহা বদ্ধমূল হইল; আর কুড়ার পালক হইয়া তাহার যে ভগবৎ কৃপালাভ হইয়াছে এ ধারণা তাহার অন্তরে দৃঢ় হইল। সেই রাত্রে তাহারা সেখান হইতে বারাণসী যাত্রা করিল। ঐ দিন তাহাদের সম্মুখে বহু লোক সাহায্যে দিনমানে গঙ্গাতীরেই কাপালিকের সৎকার হইল, সকলে নৌকা হইতেই দেখিল। বৃন্দাবন দেখিল—বড় বড় বিস্ফারিত চক্ষে কুড়া একাগ্রভাবে চাহিয়া আছে—আর চক্ষের জলে তাহার বুক ভাসিয়া যাইতেছে। যাহা হউক কাপালিকের এই পরিণাম যাহা কুড়া আজ স্বচক্ষে দেখিল, তাহাতেই তাহার ভবিষ্যৎ জীবন কতকটা নিয়ন্ত্রিত হইল, একথা বলিয়াছি। তাহার সংসার বৈরাগ্যের মূলসূত্র খুব সম্ভব এইখানেই।

এই ঘটনার পর পূর্ণ একটি বৎসর নানা-তীর্থে কাটাইয়া বৃন্দাবন আবার নিজ স্থানে ফিরিয়া বিষয়-কর্ম্মে মনোনিবেশ করিল। ইহার পর কুড়া আরও দশটি বৎসর বৃন্দাবনের আশ্রয়ে ছিল। তাহার মধ্যে আরও এমন একটি বিশেষ ব্যাপার ঘটিয়াছিল যাহা কুড়ার জীবন স্মৃতির মধ্যে উজ্জ্বল হইয়া আছে, এখন সেই কথাটা বলিয়াই এ-কাহিনী শেষ করিব।

৯

ধনবানের ছেলেদের তখনকার দিনে বাড়িতেই পণ্ডিত রাখিয়া পড়ানো হইত। যখন কুড়া বারো বৎসরের সুন্দর স্বাস্থ্যবান সদানন্দ বালকটি, তখন সে চিন্তাহরণদের সঙ্গে পণ্ডিতের কাছেই পড়িত,—বিদ্যালয়ে যাইত না। তাহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং পড়ায় মনোযোগ দেখিয়া সকলেই সুখ্যাতি করে, ছেলেদের মধ্যে তাহার স্থান ছিল প্রথম। সাহা-পরিবারের সকলেই যেন কুড়ার উপর আকৃষ্ট, কেবল গৃহিণী এসব দেখিয়া মনে মনে জ্বলিয়া মরেন। কুড়া আশ্চর্য্য রকমে তাহার আক্রোশ এড়াইয়া চলিত। স্বভাবের সরলতাই তাহাকে সকল বিপদে আপদে রক্ষা করিত। খাওয়ার সময় সকলের সঙ্গে সে দিনে ও রাত্রে, মাত্র দুইবার অন্দরে যাইত, আর সব সময়েই সে বাহিরে থাকিত। চিন্তাহরণের ঈর্ষা, বিদ্বেষ সে বরাবরই যেন অস্বীকার করিত। নিঃসঙ্কোচ সরল ব্যবহারে সে সকলকেই আপন করিত, কাহাকেও রুষ্ট হইতে দিত না। কুড়া যেন কল্পনা করিতে পারিত না এ সংসারে কেহ তাহার শত্রু থাকিতে পারে। চিন্তাহরণকে যখন সে দাদা বা সুলোচনাকে মা বলিয়া ডাকিত, তাহার সে সম্বোধন কানে গেলে তাহারাও তখনকার মত বিরূপ হইতে পারিত না, তাহার ডাকের সাড়া প্রসন্ন মুখে দিতেই হইত। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বিদ্বেষ তাহাদের মনে আসিতে পারিত না।

বৃন্দাবনের গ্রাম হইতে দশ-বারো ক্রোশ দূরে সুলোচনার পিত্রালয়। হাঁটাপথ থাকিলেও নদী থাকায় সাধারণতঃ নৌকাতেই যাতায়াত চলে। এখন গৃহিণীর ভ্রাতুষ্পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে তিনি যাইবেন, সঙ্গে চিন্তাহরণ ও গোবিন্দ যাইবে। আর তাহাদের পুরাণো চাকর বুদাও পৌঁছাইতে যাইতেছে। নৌকায় যাইবার কথায় কুড়াও ধরিয়া বসিল, সেও যাইবে। নৌকায় চড়িতে তাহার বড় আনন্দ।

কুড়ার প্রতি গৃহিণীর মনোভাব বৃন্দাবন ভালরূপেই জানিত, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহার এতটা আগ্রহ দেখিয়া বাধা দিল না, সুলোচনাও কোন আপত্তি করিল না। তাহাকে সাবধানে

রাখিবার জন্য বুদাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেও তাহার মনে বিশ্বাস দৃঢ়ই ছিল যে কুড়া দৈবানুগৃহীত, কেহ তাহার কোনও অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

প্রাতে নৌকায় উঠিয়া সকলের সঙ্গে কুড়া মহা আনন্দে চলিল। তিন চার ঘণ্টার পথ মাত্র।—চলিতে চলিতে মধ্য-পথে নৌকার ছৈ-ঢাকা ঘরের চালে ঠেস দিয়া কুড়া তখন দাঁড়াইয়াছিল, নজর ছিল তীরের দিকে। উভয় তীরেই দূর-প্রসারিত গ্রাম, বড় বড় গাছপালা, মন্দির, কত কি, আবার—মাঝে মাঝে জলের ধারে লোক সব কত কি কাজ করিতেছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তীরে খেলা করিতেছে, মা তাহাদের জলে নামিয়াছে। তন্ময় হইয়াছিল কুড়া। তখন চিন্তাহরণ ঘরের ভিতর হইতে হঠাৎ বাহিরে আসিয়া দেখিল কুড়া, দাঁড়াইয়া একাগ্রচিত্তে তীরের দিকে চাহিয়া। এখানে দাঁড়িয়ে দেখ কি ? বলিয়া সজোরে এমন ভাবে তাহাকে একটা ধাক্কা দিল যে তাহা সামলানো একেবারে অসম্ভব। সে কি ভাবে এটা করিল তাহা জানা গেল না, কিন্তু কুড়া মোটেই ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল না, সামলাইতে না পারিয়া সে জলে পড়িয়া গেল। সাঁতার সে ভালই জানিত, কিন্তু বেকায়দায় পড়িয়া প্রথমটা সে ডুবিয়া গেল। বুদা এ ব্যাপার দেখিয়া তৎক্ষণাৎ স্থানটি লক্ষ্য করিয়া ডুব দিল। আর আর সকলে হৈ-হৈ করিতে লাগিল, তাহার মধ্যে চিন্তাহরণ দাঁড়াইয়া অপ্রতিভের মত হাসিতে লাগিল।

অল্পক্ষণেই দুজনে ভাসিয়া উঠিল, তার পর কুড়াকে নৌকায় উঠান হইল। হাঁপ লাগিয়াই তাহাকে কাহিল করিয়াছিল।

ব্যাপারটা কি দাঁড়ায় সুলোচনা চুপ করিয়া তাহাই দেখিতেছিল। এখন কুড়াকে আনিয়া ভিতরে কাপড় ছাড়াইয়া শোয়ানো হইলে মাঝিরা নিরুদ্বিগ্ন হইল। তারপর সকলেই যখন চিন্তাহরণকে দোষ দিতে লাগিল, তখন সুলোচনা সেটা আর সহ্য করিতে না পারিয়া জোরগলায় মাঝিদের একটা ধমক দিয়া বলিল—ছেলেটা তো মরেনি বাছা, তোমরা এত হৈ-চৈ কর্‌য়া মরো ক্যান্। তারপর, এ ব্যাপার যাহাতে কর্তার কানে না উঠে সে বিষয়ে বিশেষভাবে বুদাকে অনুরোধ এবং সতর্ক করিয়া দিল বটে, কিন্তু বুদা একথা কর্তার কানে না তুলিয়া ছাড়িবে না, এ-কথাও সে জানিত।

দ্বিপ্রহর নাগাৎ তাহারা গ্রামে আসিয়া পৌঁছিল। তারপর তাহাদের পৌঁছাইয়া বুদা নিজ স্থানে ফিরিয়া আসিবার সময় কুড়াকেও সঙ্গে আনিতে চেষ্টা করিয়াছিল—সে রাজী হইল না। সুলোচনা সেখানে আট-দশ দিন থাকিবে।

হরি যাকে রাখেন

যে উৎসবে আসা তা দু'দিনেই শেষ হইয়া গেল। ছোট সংসারে ছোট একটি উৎসব। বৃদ্ধ পিতা, ভাই, ভাজ ও একটি বিধবা ভগ্নী লইয়াই সংসার। সুলোচনার যখন দশ বৎসর বয়স তখন মা তাহার গত হইয়াছেন। সে আজ বাইশ বৎসরের কথা।

সুলোচনার যে বড় ভাই,—তাহার প্রথম পুত্রের অন্নপ্রাশন। কিছু ধূমধাম বা বেশী লোকজন ভোজনের ব্যবস্থা নয়। সামান্য ভাবেই, নিতান্ত নিকটাত্মীয় দুই চার-জনকে লইয়া শিশুর মুখে ঠাকুরের প্রসাদ দেওয়া হইল। ভাইটি, দূরগ্রামস্থ কোন ব্যবসায়ীর অধীনে কাজকর্ম্ম করে। এই উপলক্ষে এক সপ্তাহের ছুটিতে আসিয়াছে। কাজ-কর্ম্ম শেষ হইতেই পর দিনেই সে চলিয়া গেল। দুই একদিন পরে পিত্রালয় হইতে শিশুর সহিত বধূকেও লইয়া গেল, ছেলে মামা ভাত খাইবে।

প্রাঙ্গণের মধ্যে এক প্রাচীন শিমূল গাছ—তার তিন দিকে তিনখানি ঘর। এক-খানাতে বৃদ্ধ ও বিধবা কন্যা থাকে, তার পরেই যে ঘর তাহাতে ভাণ্ডার থাকে, পুরাতন জিনিষে পূর্ণ। দক্ষিণের ঘরখানি পুত্র ও পুত্রবধূর জন্য—এখন তাহাদের অনুপস্থিতিতে সুলোচনা ছেলেদুটিকে লইয়া থাকে। কুড়াকে অবশ্য ঘরের মধ্যে পৃথক শুইতে দেওয়া হয়।

এখানে নূতন স্থানে কুড়ার বড় আনন্দ, গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে তাহার বড়ই প্রীতি জন্মিয়াছে, বেশীভাগ সময়েই সে বাহিরে কাটায়। চিন্তাহরণবা দু'ভাই সুবোধ বালকের মত বড় একটা কোথাও যায় না, মায়ের চক্ষের উপরেই থাকে।

বৃদ্ধের হাঁপানির অসুখ ছিল, মাঝে মাঝে চাগাইত, তখন তাঁহার ভয়ঙ্কর গোঙানী আর মধ্যে মধ্যে প্রবল কাশীর বেগ শুনিলে মনে হইত বুঝি দম বন্ধ হইয়া গেল। সে বড়ই করুণ দৃশ্য! এখন এই শুভ কর্ম্মের পরেই অল্প অল্প সেই রোগ আরম্ভ হইল। সুলোচনা ভাবিল, পিতা একটু সুস্থ হইলেই নিজ স্থানে যাইবে, বাপের অসুখ দেখিয়া তো যাওয়া যায় না। অসুখ কিন্তু উত্তরোত্তর বাড়িতেই লাগিল দেখিয়া সে চিন্তিত হইল। ঘরে পুরুষ মানুষ অপর কেহ ত নাই, তাহারই পুত্র দুটি ও কুড়া।

কবিরাজ যিনি, এই গ্রামের একমাত্র চিকিৎসক, একটু দূরে একখানা গ্রামের পরে তাঁহার নিবাস, সে প্রায় এক ক্রোশের ধাক্কা। অবস্থা দেখিয়া, বুঝিয়া, সুলোচনা ঠাকুরাণী চিন্তাহরণকে পাঠাইল কবিরাজকে আনাইতে। প্রতিবেশী এক বালকও তাহার সঙ্গে সঙ্গে গেল।

বৈকালে বৈদ্য আসিয়া, দেখিয়া শুনিয়া পুরাতন তেঁতুলের কাথ্ অনুপানের সঙ্গে এক ঔষধ ব্যবস্থা, আর কণ্ঠে, বুকে, পিঠে, পাঁজরে পুরাতন ঘৃতের সঙ্গে আদার রস গরম করিয়া উত্তম রূপে মালিশের ব্যবস্থা করিলেন।

ঘরে তাহাদের পুরাতন ঘৃত ছিলনা, অথচ এ বস্তুটি প্রায় ঘরেই তখনকার দিনে থাকিত। যাহা হউক কবিরাজ মহাশয় রোগীর সাংসারিক অবস্থার কথা ভাল রূপই জানিতেন। সেকালের মানুষ, দয়ালু স্বভাব, তিনি বলিলেন,—যদি কেহ সঙ্গে যায় তো আমি দিতে পারি, একটা ছোট পাথর-বাটী পাঠিয়ে দাও।

এখন কথা হইল কে যাইবে তাঁহার সঙ্গে। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, হয়তো ফিরিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণই হইয়া যাইবে। তার উপর আকাশে কালো মেঘও জমিয়াছে। কাল বৈশাখীর সময়। সুলোচনা বলিল যে চিন্তাহরণ অনেকটা হাঁটিয়াছে আর পারিবে না, গোবিন্দ ছেলে মানুষ, শরীর তেমন ভাল নয়, ঐ কুড়াই যাক্। উত্তমরূপ বিবেচনা করিয়া শেষে কুড়ার যাওয়াই ঠিক হইল, আর কেই বা আছে।

কবিরাজ উঠিলেন, তাঁহার পশ্চাতে সদানন্দ কুড়া—পাত্র হাতে চলিল। নূতন আর একখানি গ্রাম দেখা হইবে, আরও কিছু নূতন দেখিতে পাইবে, তার উপর ঐ আকাশের ঘনঘটা দেখিয়া তাহার আনন্দের সীমা নাই। গ্রাম ছাড়াইয়া যখন তাহারা মাঠে পড়িল, তখন চারিদিক মেঘে ছাইয়া ফেলিয়াছে, আকাশ থম্‌থম্ করিতেছে। বায়ু স্থির, নিস্পন্দ দেখিয়া প্রবীণ বৈদ্য বলিলেন—একটু শীঘ্র চল দেখি। কুড়া হন্ হন্ করিয়া চলিতেছে ; যদি বৃষ্টি নামে, তা হলে হে ঠাকুর কুড়ার বড়ই আনন্দ হয়।

এদিকে গৃহে—পুরাতন ঘৃতের ব্যবস্থা হইল, এখন পুরানো তেঁতুল। এ জিনিষটিও তখনকার দিনে প্রায় ঘরেই থাকিত। কিন্তু এখন গৃহকর্ত্তার বিধবা কন্যাটি উহা খুঁজিতে হাঁড়ি, সরা সবই ওলট-পালট করিয়া ফেলিল। পাওয়া গেলনা দেখিয়া সুলোচনাকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—ও দিদি, কৈ তেঁতুল তো পাওয়া যায় না দেখি।

কাজেই পাড়ায় যাইতে হইবে। বলিল,—গোবিন্দ, চলত বাবা, জিতাদের বাড়ী পাওয়া যায় নাকি একবার দেখি। সুলোচনা একটা আলো সঙ্গে লইতে বলিল। তাহারা চলিয়া গেল,—ঘরে রহিল বৃদ্ধ রোগী, সুলোচনা ও চিন্তাহরণ।

বোধ হয় একদণ্ডও যায় নাই, বাহিরে একটা ভয়ঙ্কর গোঁ গোঁ শব্দ হইল,

তারপর সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বেগে আসিলেন পবন দেবতা। কি ভীষণ হুঙ্কার, তারপর উনপঞ্চাশটি উন্মাদ মরুত-মিলিত ইন্দ্রদেবতা ঐরাবৎ পৃষ্ঠে ক্ষেত্রে নামিলেন। মেদিনী কাঁপিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে রান্না-ঘরের চালটি উড়াইয়া দেবতা উগ্রতার প্রথম পরিচয় দিলেন। অল্পক্ষণ পরেই দ্বিতীয় অভিব্যক্তিতে যাহা দেখাইলেন, তাহা যেমন নির্ম্মম, তেমনিই নিষ্ঠুর—তাহার স্মরণেই সংজ্ঞা লোপ হয়। এতদিনের সেই প্রকাণ্ড শিমূল গাছটি হেলিতে দুলিতে ভীষণ শব্দে পড়িল সেই রোগীর জীর্ণ ঘরের উপর। তাহাব দুঃসহ আঘাতে ঘরের চাল দেওয়াল সবই পড়িল, আর ভিতরে যাহারা ছিল তাহাদের কি হইল ভগবানই জানেন। ঝড়বৃষ্টির তাণ্ডবলীলা চলিল, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে পর আরও কতকক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে প্রকৃতি স্থির হইলেন। এই সামান্য তিন-দণ্ডের মধ্যে যেন একটা প্রলয় ঘটিয়া গেল।

গ্রামের মধ্যে কত পুরানো ঘরের চাল উড়িয়া কত ঘর পড়িয়া গেল। কত লোকের সর্ব্বনাশ হইয়া গেল;—কত লোক পথে দাঁড়াইল। মাসী ও বোন-পো যাহাবা তেঁতুলের খোঁজে বাহির হইয়াছিল, ঝড়ের সময় তাহারা মধ্য-পথে একটি বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল। মাসী বলিল,—আমাদের ঘবে এতক্ষণ কি হচ্ছে কে জানে। বোন-পোর বেজায় রাগ,—ঘর ছাড়িয়া এমন ভাবে পথের ধারে ভিজিতে কার ভাল লাগে। বলিল,—কি আর হবে, তাঁরা ঘরের মধ্যে আছেন বেশ ভাল, আমরাই কেবল বাইরে বেরিয়ে ভিজে মরছি। মাসীর মনে ভয় ও উদ্বেগ দুই-ই ছিল, যেহেতু ঘর তাদের জীর্ণ।

কুড়া অনেকটা দূর গিয়াছিল, মাঠ পার হইয়া রাস্তায় উঠিবার পর ঝড় আসিল, তারপর তাহারা গ্রামে ঢুকিলে বৃষ্টি আসিয়াছিল। কবিরাজ মহাশয় তাহাকে লইয়া পরিচিত এক গৃহস্থের দালানে গিয়া উঠিলেন এবং তখনকার মত নিরাপদ হইলেন। তিনি সে-রাত্রে আর কুড়াকে ছাড়িলেন না, রাত্রে তাহাকে রাখিয়া প্রাতে পাঠাইয়া দিলেন। কুড়া পরদিন প্রাতে গ্রামে আসিয়া কি দেখিল?

প্রথমে স্থান ঠিক করিতে পারিল না, সে দেখিল সে ঘর নাই, দ্বার নাই, সে প্রকাণ্ড শিমুল গাছটি নাই, বৃদ্ধ নাই কেবল গোবিন্দ সেই ধ্বংসাবশেষের কাছে দাঁড়াইয়া। তাহার মুখখানি শুষ্ক, মহা আতঙ্কে বিবর্ণ। আর তাহার মাসী নিকটে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে। তাহাদের এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া কুড়া বিস্ময়ে অভিভূত

হইয়া পড়িল। দেখিল অনেকটা স্থান জুড়িয়া গাছটি পড়িয়াছে, আর কয়েকজন গ্রামের লোক তাহার ভিতর হইতে, চাপাপড়া, ঘরের চাল কতক সরাইয়া যাহারা চাপা পড়িয়াছে তাহাদের টানিয়া বাহির করিতেছে।

কুড়া দেখিতে লাগিল। জীবনে তো এমন কখনও দেখে নাই। যাহা দেখিল তাহা যেন বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। প্রথমে অচৈতন্য অবস্থায় চিন্তাহরণকে বাহির করিল। তাহার একখানি পায়ের হাড় এমন ভাবে ভাঙ্গিয়াছে যে পা খানি ঝুলিতেছে। তারপর বৃদ্ধ রোগীর প্রাণহীন দেহ বাহির করিল। তাহার হাড় জুড়াইয়াছে, আর ভীষণ রোগের যাতনা ভোগ করিতে হইবে না; তথাপি বিধবা কন্যাটি পিতার মৃতদেহ দেখিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তারপর যখন সুলোচনার মৃতদেহ বাহির হইল, তখন কুড়া আর স্থির থাকিতে পারিল না, দর দর ধারে তাহার চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। মা, মা, বলিয়া সে কাঁদিয়া ভাসাইল। গোবিন্দের কান্না আসিল বটে কিন্তু তাহার ভয়ের আতিশয্যে যেন চক্ষের জল শুকাইয়া গিয়াছিল। সে-যাত্রায় যাহারা বাহিরে ছিল তাহারাই বাঁচিয়াছে; অক্ষত শরীরেই বাঁচিয়াছে, আর যাহারা নিরাপদ-আশ্রয় ভাবিয়া ঘরের মধ্যে ছিল তাহারাই মরিয়াছে। ঠিক যেন এই প্রাণগুলি বাঁচাইতে, অলঙ্ঘনীয় নিয়তির বিচিত্র বিধান ইহাদের ঘর হইতে এই আসন্ন দুর্য্যোগের সময় বাহির করিয়া দিয়াছিল। বৃন্দাবন এ শোক কি ভাবে সহ্য করিল তা ভগবানই জানেন। তবে তারপর আর তাহার গ্রামে বাস সম্ভব হয় নাই, শেষদিন পর্য্যন্ত নবদ্বীপেই বাস করিয়াছিলেন।

১১

এই ঘটনার পর কুড়ার সংসার-বৈরাগ্য প্রবল হইয়াছিল। সে নিশ্চিত বুঝিয়াছিল যে এই সংসার কখনই সুখের স্থান নয়। প্রথমে সেই কাপালিকের মৃত্যু এবং এখন এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা এই দুইটিই তাহার জীবনে সংসারে আসক্তির মূল শিথিল করিয়া দিল। মনে মনে এখন হইতে সঙ্কল্প করিল যে ত্যাগীর জীবনই গ্রহণ করিবে। এ জীবন শান্তিতেই যদি যাপন করিতে হয় ত এ পৃথিবীতে গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

কুড়ার যখন ষোলো বৎসর বয়স, তখন বৃন্দাবন সাহা নবদ্বীপেই দেহ ত্যাগ করেন। চিরকাল সুখস্বচ্ছন্দে থাকিবার ব্যবস্থা করিলেও কুড়া বৃন্দাবনের সংসারে আর

থাকিতে পারিল না। শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকিয়া গেলেই কাশীতে থাকিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনায় জীবন যাপনের অভিপ্রায়ে বাহির হইয়া পড়িল।

কাশীতে আসিয়াই প্রথমে বিখ্যাত স্বামী বিশুদ্ধানন্দের আশ্রমে বিদ্যার্থী ব্রহ্মচারী-রূপে থাকিয়া অধ্যায়নের চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ সন্তান না হইলে স্বামী বিদ্যাদান করিতেন না। প্রথমে তার ভাব এবং পবিত্র মূর্ত্তি দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, পরে যত্নপূর্ব্বক নিকটে বসিতে আজ্ঞা করিলেন বটে,—কিন্তু তারপর যখন, কোন্ জাতীয় শরীর, এই প্রশ্ন উঠিল তখনই গোল বাধিয়া গেল। প্রশ্নের উত্তরে কুড়া যাহা শুনিয়াছিল তাহাই,—জাতিসম্বন্ধে কিছুই জানি না, তবে আমি এক বৈষ্ণের পালিত পুত্র। আমার পালক যিনি, তিনি আমার পিতামাতার কথা কিছুই জানিতেন না, গঙ্গাতীরে পথ হইতে তিনি অতি শিশুকালে আমার প্রাণরক্ষা করিয়া নিজগৃহে স্থান দিয়াছিলেন, ইহাই শুনিয়াছি।

কুড়ার জন্মকথা, বৃন্দাবন কখনও নিজে তাহাকে বলে নাই। তাহার সংসারে থাকিতে, বড় হইয়া বুদার নিকটে আনুপূর্ব্বিক সকল কথাই কুড়া শুনিয়াছিল। এমন কি নবদ্বীপের বাড়িতে আনিয়া তাহার নাড়ী-কাটা হয় এ-কথাটি পর্য্যন্ত।

যাহা হউক দণ্ডীস্বামী যখন কুড়াকে গ্রহণ করিলেন না, তখন বঙ্গদেশীয় অপর এক সাধুর আশ্রয় মিলিল। তিনি স্বামী যোগানন্দ সরস্বতী। তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া কুড়া কাশীতে সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নে ডুবিয়া গেল। পাঁচটি বৎসর একাত্মমনে, গভীর অধ্যবসায় সহকারে সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, দর্শন শাস্ত্রাদি অভ্যাস করিয়া কুড়া কাশী পরিত্যাগ করেন। তারপর উত্তরভারতের নানাতীর্থে ভ্রমণ শেষে বৃন্দাবনে এক সিদ্ধ অবধুতের সঙ্গে তাহার মিলন ঘটে। তাঁহার আশ্রয় পাইয়া কুড়ার জীবন সার্থক হইল। সরল, অকপট সত্যজীবনকাহিনী তাহার নিজ মুখে শুনিয়া সেই অবধূত তাহার প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি বলেন,—বৎস! তুমি উচ্চ জাতীয় মানুষ, ভগবান তোমাকেই কৃপা করবেন। তুমি সেই সত্যকাম জাবালী, জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া আসিয়াছ, আমায় ধন্য করিতে।

বৃন্দাবনে ছয়টি বৎসর গুরুর সঙ্গে মিলিয়া তাঁহার সাধন, অবশেষে গুরুর অন্তর্দ্ধানের পর তাহার বৃন্দাবন ত্যাগ। এই সময়েই তাহার ধর্ম্মজীবনের মধ্যে এক বিচিত্র অধ্যায় আছে যাহা আমি তাহার নিজ মুখেই শুনিয়াছিলাম, কিন্তু সে বিস্তৃত অধ্যায় এখানে নয়।

তখন হইতেই তাঁহার তিনটি বিচিত্র নিয়ম ছিল। প্রথম, কোন স্থানেই ত্রি-রাত্রির অধিক বাস না করা, দ্বিতীয়, শিষ্য অথবা সেবকরূপে কাহাকেও গ্রহণ না করা এবং তৃতীয় নিয়ম,—কোনও গৃহী বা সন্ন্যাসীর আশ্রমে প্রবেশ না করা। কোন মন্দির বা বৃক্ষতলে থাকিয়া এবং কাহারও নিকট অন্ন ভিন্ন অর্থ গ্রহণ না করিয়া সরলতম জীবন যাপন আর বরাবর পায়ে হাঁটিয়াই সর্ব্বত্র ভ্রমণ। নিস্পৃহ জীবনে যথার্থ সন্ন্যাসী যাহাকে বলে তাঁহার মধ্যেই দেখিয়াছিলাম। সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধির বিকাশ হইলে একজনের কিরূপ অবস্থা হয় তাঁহার মধ্যে প্রকট হইয়াছিল। তাঁহার গুরুদত্ত নাম ছিল অর্কাবধূত, কিন্তু সে নামে কেহই তাঁহাকে জানিত না, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে শুধু অবধূত নামেই পরিচিত ছিলেন।

১২

হরি যাকে রাখেন, সাধু-জীবন বৃত্তান্তের যিনি নায়ক, বৃন্দাবন সাহার আশ্রয়ে তাঁর নাম ছিল কুড়া, এখন অবধূতের মন্ত্র পাইয়া তাঁহার নাম হইয়াছিল, অর্কাবধূত। এখন হইতে তাঁকে আমরা অর্ক বলিয়াই ডাকিব। প্রায় বারো বৎসর তাঁহার সাধন জীবনের যে কথা তার মধ্যে ছয় বৎসর কাশীতে দর্শনশাস্ত্রাদি অধ্যয়নে আর আনুসঙ্গিক সংযমাত্মক সাধন-ভজনে কাটিয়াছে; তার পর বৃন্দাবনে তাঁর গুরু সাক্ষাৎকার। সেই যোগী মহাত্মার দর্শন পাইয়া তাঁহার জীবনে এক বিচিত্র অধ্যায় আরম্ভ হইয়া গেল।

সাধনার প্রথম অবস্থায় গুরু-কৃপায় তাঁহার যে সকল অধ্যাত্ম শক্তির স্ফুরণ হইয়াছিল, তাহার মধ্যে প্রাণের বিস্তার এবং উচ্চ উচ্চ অনুভূতি সকল তাঁহার গুরু লক্ষ্য করিলেন। কারণ এমনটি প্রায় সাধারণ শিষ্য-সেবকের হয় না। তাই গুরু একদিন কথায় কথায় একটা আবেগে যখন তাঁহাকে বলিলেন; বৎস! তোমায় পেয়ে আমার জীবন সার্থক। তাহাতে অর্ক সঙ্কুচিত হইয়া গেলেন, বিষণ্ণ মুখে তাঁর চরণ স্পর্শ করিয়া বলিলেন, আপনার মুখে ঐ কথায় অহংকার যদি মাথা তোলে, তা হলে আমার সর্ব্বনাশ হবে। গুরু তাঁর কথা শুনিয়া বলিলেন, বাবা! অহংকার যে কি বস্তু, তা তুমি শিশুকাল থেকেই ভাল বুঝেছ। আজ যদি তোমার ঐ বিকৃত রোগটি থাকতো, তা হলে কি এত সহজে ঐ অবস্থা আসে? তোমার পরিচয় আমার প্রাণের গুহার মধ্যে ধরা আছে।

ক্রমে ক্রমে অর্কের সাধন গভীর হইতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি যোগবিভূতির

বিকাশও হইতে লাগিল। সাধারণের গোচরে তাঁহার মধ্যে ঐ বিভূতির প্রথম প্রকাশ,—একদিন প্রভাতে দেখা গেল অর্ক আশ্রম হইতে বাহিরে আসিয়া একেবারে উলঙ্গ অবস্থায় একটা গাছের চারিদিকে ঘুরিতেছেন। তাঁহাদের আশ্রমের পাশে একদল কাঠুরিয়া থাকিত। তাহারা প্রভাতে বাহির হইয়া যাইত; বহু দূর বনেজঙ্গলে কাঠ কাটিয়া সারাদিনের পর সন্ধ্যায় সেই বোঝা বাজারে বিক্রয় করিয়া, সেই পয়সায় বাজার করিয়া রাত্র প্রহর হইয়া গেলে তবে তাহারা বাসায় ফিরিত। তাহারা অর্ককে ভাল-বাসিত, ভক্তি করিত, অরক্ বাবা বলিয়া ডাকিত। এখন, আজ সকালে তাঁহাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখিয়া তাহাদের মধ্যে একজন একটু অগ্রসর হইয়া আসিল, তার পর অরক্ বাবার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মুণ্ড ঘুরিয়া গেল। অরকের চক্ষু দুটি লাল—তাহাতে পলক নাই, তাহার উপর মুখমণ্ডলের আকার যেন বাড়িয়া গিয়াছে আর তাহা হইতে এক অপূর্ব্ব জ্যোতি বাহির হইতেছে—তাহারা জীবনে কখনও এমন জ্যোতি সে দেখে নাই। প্রথমে তাহারা ভয় পাইয়া গেল, এখন কি করা উচিত তাহাই ভাবিতেছিল, এমন সময় দ্বিতীয় ব্যক্তি চিৎকার করিয়া সেখানে মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

তাঁহার সম্মুখেই এই সব ব্যাপার হইতেছে, এগুলি যে অর্কের গোচরীভূত হইয়াছে, তাঁহার মুখের দিকে চাহিলে মনে হয় না। দ্বিতীয় ব্যক্তির পতন শব্দে—আসপাশের লোক দুই একজন আসিয়া উপস্থিত হইল, ক্রমে অর্কের গুরু অবধূতও আসিয়া পড়িলেন—তিনি অর্কের মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন পাশেই যে একটি লোক মূর্চ্ছাহত পড়িয়া আছে, এ কাহারও লক্ষ্যের বিষয় হইল না। সকলে অবাক হইয়া অর্কের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দেখিতে লাগিল—অর্কের বাহ্যজ্ঞান নাই, ধীরে ধীরে সেই গাছটি প্রদক্ষিণ করিতেছেন।

অবধূত কাহাকেও কিছু না বলিয়া সেই স্থানেই বসিয়া পড়িলেন। যে ব্যক্তি অজ্ঞান অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিল, সে তখন চাহিয়া দেখিল, তখন অপর দুইজন তাহাকে উঠাইল। সে বসিলে তাহাকে প্রশ্ন করা হইল, তোমার কি হইয়াছিল? সে বলিল, আমি অরকজীর মধ্যে শিবমূর্ত্তি দেখেছিলাম, যেন মহাদেব আমার সুমুখে এসে দাঁড়ালেন, তাঁর চক্ষের দিকে চেয়ে আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। এই কথা বলিতে বলিতে সে এমন করুণ স্বরে রোদন করিতে লাগিল, দেখিয়া গুরু অবধূতের চক্ষেও জল আসিল।

যাহা হউক, সেই দিনের ব্যাপার হইতে সকলে অর্ককে অসাধারণ চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে অর্কের আহারের চেষ্টা গেল—কেহ তাঁহাকে আহার না করাইলে খাওয়া হইত না—বাক্যালাপও বন্ধ হইল। কাহাকেও কিছু না বলিয়া একদিন তিনি কোথায় চলিয়া গেলেন—অনেক অনুসন্ধানের পর তাঁহাকে অচৈতন্য অবস্থায় যমুনাতীরে এক বনের মধ্যে পাওয়া গেল। তখন হইতে একজন সর্ব্বদা তাঁহার কাছেই থাকিত। এমন সময়ে একদিন গুরু অবধূতের সামান্য জ্বর হইল। দ্বিতীয় দিনে তিনি শয্যাগত হইলেন। তৃতীয় দিনে তিনি অর্ককে কাছে ডাকাইয়া নিভৃতে অনেকক্ষণ কথা কহিলেন। সেই রাত্রের শেষে, ঠিক ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে তিনি দেহ ত্যাগ করিলেন। অর্কের তখন সহজ অবস্থা, তিনি আশ্রমের মধ্যে এক তমাল গাছের তলায় গুরুর দেহ সমাহিত করিলেন। তিনটি দিন ও রাত্র সেই সমাধির উপর আসনে কাটাইয়া চতুর্থ দিনে ওখানকার ভক্তমণ্ডলীকে কাঁদাইয়া অর্ক বৃন্দাবন হইতে যাত্রা করিলেন।

পায়ে হাঁটিয়া মাঘ মাসের প্রথমে প্রয়াগে আসিয়া কিছু দিন বাস করিলেন—সেখানে অনেকেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। আবার সেখান হইতে হাঁটা-পথে অর্ক যাত্রা করিলেন, সেখানে আর তাঁহাকে কেহ দেখিতে পাইল না। তারপর তিনি কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং গুরুর আশ্রমে ত্রিরাত্র কাটাইয়া আবার হাঁটিতে আরম্ভ করিলেন। প্রায় এক মাস হাঁটিয়া গঙ্গার ধারে ধারে অর্কাবধূত ভাগলপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শিশুকালের স্মৃতি তাঁহার লুপ্ত হয় নাই, এখানে আসিয়া সেই বিধুদের বাড়ী যেখানে ছিল সেখানে দেখিলেন এক প্রকাণ্ড দোতালা কোঠা উঠিয়াছে। পাশে যে বাগান ছিল সে স্থান উঁচু পাচিলে ঘেরা, তার পাশে পার্ব্বতীদের ঘর ছিল। তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে সেই খোলার ঘরের অবস্থা ভাল নয় বরং শোচনীয় বলিলেই হয়—যাহাতে গৃহস্বামীর চরম দারিদ্র্য সূচনা করিতেছে। ধীরে ধীরে অর্ক সেই ঘরের দিকে চলিলেন। ভিতর দিকে পৌছিয়া দেখিলেন দুটি নারী, একটি বৃদ্ধা অপর যুবতী,-গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত। প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া দেখিতে দেখিতে যুবতী হঠাৎ একবার সেই দিকে চাহিতেই—অর্কাবধূত,-পার্ব্বতী! পার্ব্বতী! বলিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইলেন। পার্ব্বতী চমকিত হইয়া প্রথমে দুইপা পিছাইয়া গেল,—তারপর অনেকক্ষণ মুখের দিকে চাহিয়া সে বলিল পঙ্কু! কুড়ার তখনকার ঐ নামই ছিল। সে ঐ নামেই তাহাকে জানিত।

পার্ব্বতী আসন আনিয়া পাতিয়া দিল, তারপর জল আনিয়া তাঁহার পা ধোয়াইয়া বস্ত্রে মুছাইয়া দিল। তাহার ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধা মা তখন জিজ্ঞাসা করিল, কে ইনি, পার্ব্বতী? সে কেবল বলিল, সাধু!—আর কিছু বলিল না। এই যে এতদিন পর দেখা—কেহ কাহাকেও কোন প্রশ্ন করিল না। আজ প্রায় দশ বৎসর পার্ব্বতী বিধবা হইয়াছে। স্বামীঘর তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই। অনেকদিন হইল তাহার বাবাও মারা গিয়াছে। দুটি গরু আর একটি দুই বিঘা আখের ক্ষেত রাখিয়া গিয়াছে—তাহা অবলম্বন করিয়াই ইহাদের অসনবসন চলিতেছে। পার্ব্বতীর স্বামী সেই যে বিবাহ করিয়াছিল,—আর দেখা হয় নাই। কোন খোঁজখবরও করে নাই। এখন তাহাদের চরম দুরাবস্থা, এবৎসর জমিদার বাকী খাজনার জন্য তাহাদের ক্ষেতের আখ সব লইয়াছে তাই তাহাদের এখন দিনচলা দুর্ঘট হইয়াছে।

৩

অরক্ অল্পক্ষণ বসিয়া, প্রশ্নের দ্বারা যাহা জানিবার জানিয়া লইলেন—তারপর, এখনি আসছি বলিয়া চলিয়া গেলেন, দেড়ঘণ্টাখানেক পরে চাল-ডাল-আটা আনাজ প্রভৃতি অনেক কিছুই ভিক্ষা করিয়া এক বোঝা লইয়া আসিলেন। পার্ব্বতী সে সকল দেখিয়া অবাক হইয়া গেল, বলিল, তুমি আমাদের অতিথি, কোথায় আমরা তোমায় খাওয়াবো তা নয় তুমি অপর জায়গায় ভিক্ষা করে আনলে? অরক বলিলেন, পার্ব্বতী, এখনও বুঝ নাই কে কাহাকে খাওয়ায়। তুমি আমায় খাওয়াও না, আমিও তোমায় খাওয়াই না। এই অন্নময় শরীর আপনি নিজের জন্য অন্ন আকর্ষণ করে। শরীর যতদিন আছে তার জন্য অন্ন আসবে। কোথা হতে আসবে, কেমন করে আসবে তার হিসাব করতে তুমি পারবে না। এখন তুমি স্বচ্ছন্দে আপন কাজ কর, আমি একটু ঘুরে-ফিরে স্নান করে আসছি।

অর্ক চলিয়া গেলেন, পার্ব্বতী নিজ কর্ম্ম হাতে লইয়া ভাবিতে লাগল—এতদিন পরে ভগবান কি মুখ তুলিয়া চাহিলেন? তাহার মনে হইল, কাল রাত্রে শুইয়া শুইয়া সে কত-কি যে ভাবিতেছিল, আর অন্তর্য্যামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিল, হে ঠাকুর! এই বৃদ্ধা জননীকে লইয়া আর আমি এ সংসারটা টানিয়া লইয়া যাইতে পারিনা, উপায় কর তুমি, আমার কি শক্তি। এমন করিয়া আর কতদিন চলিবে?

অর্ক স্নান করিয়া আসিবার সময় একজনকে সঙ্গে আনিলেন। তাহাকে আসিয়া

তফাৎ হইতে পার্ব্বতীদের ঘর দু'খানি দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, তোমায় চারটি দিন সময় দিচ্ছি, এই ঘর দু'খানি ভাল করে মেরামত করে দাও।—আজ হতেই কাজ সুরু করে দাও।

পার্ব্বতীদের ঘরের পাশে যে পাকা দু'তলা বাড়িখানি, অর্ক সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গৃহস্বামী বাঙ্গালী বাবু, তিনি পবিত্র এক সাধু মূর্ত্তি দেখিয়া অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা করিলেন। সাধু বলিলেন, কয়েকদিনের জন্য আমি আপনার আশ্রয় চাই। আহারাদির জন্য চিন্তা নাই, কেবল স্থান। গৃহস্বামী সানন্দেই রাজী হইয়া তাঁহার বাহিরের ঘরখানি ছাড়িয়া দিলেন। কথা-প্রসঙ্গে অর্ক জানিয়া লইলেন যে প্রায় বারো বৎসর পূর্ব্বে, এ বাড়ীর পূর্ব্ব অধিকারীর ভয়ানক দুর্গতির সময়েই তিনি এখানি কিনিয়াছেন,—এখানে তাহারা অনেক কিছু দুর্ণাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন, শেষে আদালতে তাহার ছয় বৎসর সশ্রম কারাবাস দণ্ড হয়। এখন তাহারা যে কোথায়, কেহ জানেনা। অর্কাবধূত অনেক খোঁজ করিয়া বিধুর বাপকে বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন,—সকলেই বলিল যে তাহারা দেশত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

সেইদিন বৈকালে গঙ্গার ধারে ধারে সেই কাপালিকের আশ্রমের দিকে গিয়া দেখিলেন, এক বিরাট স্তূপ, জঙ্গলে পূর্ণ। অনেকক্ষণ দেখার পর ঘন জঙ্গলের ভিতর হইতে সেই ভগ্ন মন্দিরের ত্রিশূলটি দেখা গেল, এই টুকুই জাগিয়া আছে মাত্র।

অরক আট দশ দিনের মধ্যেই পার্ব্বতীদের ঘর-দ্বার, গোয়াল সব কিছুই নূতনের মত করিয়া সেই স্থানের অবস্থা ফিরাইয়া দিলেন। নিজে সেই ভদ্রলোকের আশ্রয়ে থাকিতেন। তাঁহার থাকা সুধু রাত্রেই হইত, দিনমানে তাঁহাকে কেহই দেখিতে পাইত না। তিনি কি করিতেন, কোথায় যাইতেন, কেহই জানিত না। ঠিক সন্ধ্যার পরেই তিনি যখন আসিতেন এক দুই তিন চার জন নিত্যই তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিত। তাহার মধ্যে নানাপ্রকার লোকই থাকিত—একজন বঙ্গদেশীয় চাকুরে লোক—এখানে আদালতে কাজ করিতেন। ভক্তিমান, সাধু প্রকৃতির লোকটি, নিত্যই আসিয়া অর্কাবধূতের সঙ্গ কামনা করিত; তাহার নাম লোকনাথ। এই লোকনাথকে সহায় পাইয়া অর্ক এখানে একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়িয়াছিলেন। সেটা কিছু পরের কথা। এখন লোকনাথকে নিভৃতে একদিন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি নিত্যই আস দেখি, বল দেখি তোমার আসল কথাটা কি, কি চাও তুমি আমার কাছে।

লোকনাথ বলিল, আজ আমার বড় শুভ দিন, রোজই আমি আসি কিন্তু কোন দিনই এমন সুযোগ ঘটে না। আমি যা চাই তা ত আপনি জানেন। এই কয়দিনে আমি ঠিক বুঝেছি যে আপনি অন্তর্য্যামী, আমায় ফাঁকি দিবেন না, প্রভু! আমি অকিঞ্চন, অতি দুঃখী।

অর্ক বলিলেন,—দেখ লোকনাথ, এখানে আমার সময় অল্প,—এই কালের মধ্যে বিশেষ কিছু যে হতে পারে তা মনে হয় না। তবে ভগবানের কাছে, তাঁকে উদ্দেশ করে যদি তুমি একটা কাজের ভার নাও,—আমি নিশ্চয় বলছি তিনি তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করবেন।

নিভৃতে দুজনের সে রাত্রে অনেক কথাই হইল,—শেষে বড় আনন্দেই লোকনাথ ঘরে ফিরিলেন।

১৪

এক সপ্তাহ পরে—অর্ক একদিন সন্ধ্যার পর আসিয়া দেখিলেন, পার্ব্বতীর মার শেষাবস্থা। মৃত্যুশয্যার পাশে গিয়া অর্ক যখন দাঁড়াইলেন তখনো তাহার জ্ঞান আছে। একপাশে পার্ব্বতী কাঁদিতেছে,—দেখিয়া অর্ক তাহাকে সান্ত্বনা না দিয়া বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা, তোমার এখন কি কথা আছে বল,—কি ইচ্ছা হয় তোমার? বুড়ি বলিল, আমার একমাত্র দুঃখ পার্ব্বতীকে বড় অসহায় অবস্থায় রেখে যাচ্ছি! সে বড় পবিত্র, বালিকা বয়স থেকে আপন মন্দ অদৃষ্ট ভেবে আজ বিশ বৎসর সকল দুঃখ সহ্য করছে। কখনো আমায় অযত্ন করে নি,—কখনো কাহারো দ্বারে যায় নি। কিন্তু এই গ্রামের কয়েকজন বদলোক, আমি জানি আজ দুতিন বৎসর ধরে একে জ্বালাতন করছে, আমি না থাকলে ওরা কি যে ব্যবহার করবে সেকথা ভেবে আমি শান্তি পাচ্ছি না।

অর্ক তখন বলিলেন, মা! তোমার কোন চিন্তা নেই, পার্ব্বতীকে কোন দুষ্টলোকে কখনো কোন দুঃখ দিতে পারবে না, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো—মানুষে মানুষকে শান্তি বা পীড়ন করতে পারে না,—তোমার পার্ব্বতীকে ভগবান সর্ব্বদা রক্ষা করবেন। এখন বলো আর কি তোমার কথা—

বৃদ্ধা তাহার ক্ষীণ হাতখানি তুলিয়া অর্কের দিকে ইঙ্গিত করিল। অর্ক অগ্রসর হইলে বৃদ্ধা তাহার কম্পিত হাতখানি দিয়া অপর হাতে পার্শ্বে উপবিষ্ট ও রোদনপরায়ণা, পার্ব্বতীর হাতখানি ধরিয়া অর্কের হাতের উপর রাখিয়া বলিল, তুমি একে রক্ষা করো,—এর আর কেউ আপন বলতে রইল না।

একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বৃদ্ধা পুনরায় বলিল, বাবা বড় অসময়েই তুমি এসেছ, আমাদের উপর ভগবানের কতো দয়া, আমার মনে হচ্ছে যে তিনিই তোমায় পাঠিয়েছেন আমার এই দুঃসময়ের জন্যই। আমি মেয়েমানুষ, ভগবানের ভজন-সাধন কিছুই জানি না, বিপদাপদ ব্যতীত কখনো তাঁকে ডাকিনি,—এখন দেহ ছাড়বার সময় আমার বড়ই ভয় হচ্ছে। পরলোকে আমার কি হবে ভেবে শান্তি পাচ্ছি না।

অর্ক তখন ধীরে ধীরে বৃদ্ধার মাথার কাছে গেলেন, মুখটি নীচু করিয়া তাহার কানের কাছে মৃদুস্বরে অল্প কয়েকটি কথা উচ্চারণ করিয়া বলিলেন, এখন আর কোন চিন্তা না করে তুমি মনে মনে এই নামটি জপ করতে থাক,—এতেই তোমার কল্যাণ হবে।

উপদেশ মত জপ করিতে করিতে বৃদ্ধার চক্ষু স্থির হইয়া আসিল,—তারপর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া ইহ-জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ শেষ করিয়া বৃদ্ধা পরম দেবতার আশ্রয় পাইল।

কন্যার যেটুকু কর্ত্তব্য—তাহা পালন করিতে সাহায্য করিয়া পঞ্চম দিনে অর্ক পার্ব্বতীকে জিজ্ঞাসা করিল,—পার্ব্বতী! তুমি এখন কি করতে চাও?

সে বলিল, এখানে থাকতে পারব না, আমি তোমার সঙ্গে যেতে চাই।

অর্ক বলিল,—আমি ফকির, ভিক্ষুক মানুষ, তোমায় নিয়ে কোথায় যাব, তাতে আমাদের উভয়েরই ক্ষতি আছে। আমি অনেকদিন এখানে আছি, এখন আমায় যেতে হবে। যদি একটু সাহস করে এখানে থাকতে পার তা হলে ভাল হয়। যাতে তোমার কোন ভয় না থাকে, অপর কারো অত্যাচারের আশঙ্কা একেবারে মন হতে চলে যায় আমি তার ব্যবস্থা করব,—তুমি কি এখানে থাকবে?—

পার্ব্বতী বলিল, কি করে তুমি সে ব্যবস্থা করবে? আমি একলা থাকব অথচ ভয় থাকবে না, এ কি করে হবে! তিনজন রাক্ষস আজ দু'তিন বৎসর আমার পেছনে লেগে আছে, তোমার এখানে আসার দিন থেকে তাদের আর দেখি না। এখন আবার মাও নেই,—আমার মা এই বুড়ো বয়সেও কি তেজের সঙ্গে আমায় রক্ষা করে এসেছেন তা তুমি জান না—এখন ত আর তিনি নেই!

অর্ক বলিলেন,—আমি প্রথমে তোমায় দীক্ষা দেব। গুরু-কৃপায় এখন আমার সে শক্তি হয়েছে। তিনি অন্তর্য্যামী, আমার-তোমার সকল কথাই জানেন। আমি তোমায় যে মন্ত্র দেব তাতেই তোমার ভয় চিরকালের মত মন হতে চলে যাবে। তুমি প্রস্তুত হও।

দীক্ষা-অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই পার্ব্বতীর অপরূপ ভাবান্তর হইল ; সত্যই ভাবান্তর হইল। এই ভাবান্তর সুধু মনের ব্যাপার নহে,—সঙ্গে সঙ্গে তার মূর্ত্তিও বদলাইয়া গেল, যে কেহ তাহার দিকে চাহিল সে মুগ্ধ হইল, তাহার লাবণ্য, মাধুর্য্য এমনই চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিল যে তাহার দিকে চাহিলে আর চক্ষুর নিমেষ থাকে না, অপলক নেত্রে দেখিতে ইচ্ছা করে। যে দেখে সেই অবাক হইয়া যায়। তাহার চক্ষু ঈষৎ রক্তবর্ণ, তাহাতে যেন জলভরা। কানে মন্ত্র যেই মাত্র গেল, তাহার চৈতন্য প্রথমে স্তম্ভিত, তাহার পর ধীরে ধীরে মন্ত্রের শব্দ উপলক্ষ করিয়া বিস্তৃত হইতে লাগিল—এই ভাবে তাহার আত্মচৈতন্য প্রসারিত হইতে আরম্ভ করিয়া তাহাকে যেন অনন্তের পথে লইয়া যাইতেছে—এই অনুভব তাহার মধ্যে হইতে লাগিল।

১৩

মন্ত্রের গুণ কিনা কে জানে পার্ব্বতীর এমনই অবস্থা হইল যে অর্ক তাহাকে কিছুদিন একা ফেলিয়া যাইতে সাহস করিলেন না। দীক্ষার ফল এতটা গভীর হইবে তাহা তিনি ঠিক অনুমান করিতে পারেন নাই। পার্ব্বতীর যে ভাবে পূর্ব্ব জীবন কাটিয়াছে, তাহাতে তিনি আশা করিয়াছিলেন যে বাহ্য বিষয়ে তাহার কর্ম্মশক্তি বাড়িবে, আত্মনির্ভরশীল হইবে, এবং সে সাহস করিয়া একাকিনী জীবনযাপন করিতে পারিবে। এখন তাহার অন্নবস্ত্রের কষ্ট ছিল না, নিজ স্থানে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে তাহার কোন আশঙ্কার কারণও ছিল না। অধ্যাত্ম-শক্তির বিকাশে দুষ্ট, দুর্জ্জনের ভয়ও তাহার তিল মাত্র ছিল না, কিন্তু কি জানি কেন তাহার বাহ্য অবস্থা ক্ষীণ হইতে লাগিল। ব্যবহারিক জীবনে তাহার দৈনন্দিন কর্ম্মশক্তি যেন কতকটা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, বোধ হইল। কোন কর্ম্মে আঁট নাই, এই ভাবটি লক্ষ্য করিয়া অর্ক তাহাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিল,—

পার্ব্বতী, তুমি এখন বোধ হয় স্বাধীন ভাবে, জীবন যাপনের সম্পূর্ণ উপযুক্ত হয়েছ। তবুও কেন এমন হয় বল দেখি? ঠিক এ অবস্থায় তোমায় রেখে যেতে ত পারছি না। এদিকে আমারও যাওয়া দরকার,—একবার দূর পর্য্যটনে যেতে হবে,— তোমায় ত বলেছি।

—এখন তুমি আমার গুরু হয়েছ, এখনও আমি তোমাকে সহজ ভাবে সাহস করে সব বলতে পারি না—কেমন একটু ভয় ভয় করে। আমার মনের মধ্যে কত রকম ভাব হয়। আমি অবাক হয়ে যাই, সব কথা বলতে যেন বাধে।

এখন তো তোমার প্রবর্ত্তকের অবস্থা, মনের বহু রূপ, বাসনার নানা তরঙ্গ তো মনে উঠবেই, আবার মিলিয়ে যাবে। তুমি, ইষ্টতে যতটা মন স্থির করতে পারবে ক্রমে ক্রমে অধ্যাত্ম ঐশ্বর্য্য ফুটে উঠবে তোমার মধ্যে, তখন ঐ সকল মনের বহু বিক্ষেপ মিলিয়ে আসবে। আমার মনে হয় তুমি যদি ব্যবহারিক কাজকর্ম্মে একটু মন দাও তাহলে সবদিক দিয়েই ভাল হয়। বাহ্য কর্ম্মেরও সার্থকতা আছে সংসারে।

পার্ব্বতী বলিল,—আমার মনের মধ্যে যে ব্যাপারটা প্রবল ভাবে এখন কাজ করছে সেটা তোমায় বললে বোধ হয় ভাল হয়।

শুনিয়া অর্ক বলিলেন, দেখ পার্ব্বতী, তোমার কথা যেটা আমার শোনা দরকার তুমি মনে কর, সেটা তুমি অবশ্যই বলবে। আশা করি তুমি আমার কথা বুঝতে পেরেছ? ভাবের মাধুর্য্য বেশী কথায় নষ্ট হয়।

—তুমি কি আমায় এতটাই ছেলেমানুষ মনে কর যে কোনটা তোমায় বলা দরকার আর কোনটা নয় সেটা আমি বুঝতে পারি না? দীক্ষার পর থেকে আমার কেমন একটা আনন্দময় নেশার মত ভাব আসে, কখনো কখনো দিন-রাতই সেটা থাকে। তখন কারো সঙ্গে কোন আলোচনা ভাল লাগেনা—প্রবৃত্তিও হয় না। আবার কখনো কখনো হয়ত সে ভাবটা থাকে না।

—তা আমি জানি, ওটি তোমার দুর্ল্লভ ধ্যানের অবস্থা, -ইষ্টানুরতি,—

—আমি সে অবস্থার কথা বলছি না, যখন সে অবস্থা থাকে না তখনকার কথাই বলছি। প্রথম প্রথম ধ্যানশূন্য অবস্থা এলে আমার মনে ভয়ানক কষ্ট হোতো, যেন আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেল, আবার কেমন করে সে অবস্থা আসবে,—তার জন্য প্রাণে এমনই একটা অশান্তি হ'ত যে খাওয়া-নাওয়া-শোয়া কিছুই ভাল লাগতো না। জীবনটা যেন দুঃসহ,—বেঁচে কোন সুখ নেই—

—হাঁ, এ অবস্থায় ওটা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

—কিন্তু এখন কিছুদিন থেকে আর একটা ব্যাপার হচ্ছে সেইটি আমার তোমায় না বললেই নয়, অথচ বলতে সাহস হয় না। তুমি যদি আমায় সাহস দাও ত বলি।

অন্তরে চিন্তিত ভাব, মুখে একটু হাসিয়া অর্ক বলিলেন, কী এমন কথা যার জন্য তোমায় সাহস দিতে হবে? আমার কিন্তু তা শুনেই সাহসের অভাব বোধ হয়েছে। তা হোক, কিন্তু যখন তা আমায় না শুনালে নয় তখন আমি তোমায় অভয় দিচ্ছি তুমি নিঃসঙ্কোচেই বল।

হরি যাকে রাখেন

—আজ কয়েক দিন থেকে আমার ইষ্টের আসনে তোমায় দেখছি,—আমার ভিতরে-বাইরে তোমার মূর্ত্তি অবিরাম দেখি, ধ্যানে তোমার মূর্ত্তি ছাড়া আর কিছুই দেখি না। এমন কি মনে জোর এনে ইষ্টের দিকে যতই লক্ষ্য স্থির করতে যাই দেখি তুমি মূর্ত্তিমান হয়ে আমার অন্তরের সবটা জুড়ে রয়েছ।

—বুঝেছি পার্ব্বতী, তত্ত্বটা তোমায় বলে দিচ্ছি—সেটি এই যে, তোমার প্রিয় রূপেই ইষ্ট তোমার কাছে প্রকাশিত হবেন। আমায় তুমি শ্রদ্ধার চোখে দেখেছ; আমার মূর্ত্তি তোমার প্রিয়, তোমার চোখে মনোরম বলেই আমার মূর্ত্তি নিয়ে ইষ্ট তোমায় এখন দেখা দিচ্ছেন জানবে, কিন্তু ঐ রূপটা উড়ে যাবে, রূপ আর থাকবে না—শেষে ইষ্ট স্বরূপেই তোমার মধ্যে প্রকাশিত হবেন। রূপটা মাঝের অবস্থা, ধ্যানে যখন রূপ আসে তখন বুঝতে হবে আত্মার স্থূল থেকে সূক্ষ্মের দিকে গতি হয়েছে। আর স্থূলেব প্রভাব যত কিছু প্রিয় রূপের তৃপ্তিময় নাটকেব অভিনয় শেষ হয়ে যাচ্ছে। বেশীদিন এ অবস্থা থাকবে না।

—তোমার জ্ঞান আমার চেয়ে ঢের বেশী, তুমি ভজন-সাধনের আগু-অন্ত জানো, তাই তুমি বেশ বুঝেছ, কিন্তু আমি ত তা জানি না, আমার কিন্তু তোমার বুঝানোটা ঠিক লাগল না। আমার এই ভাবটিই ভাল লাগছে,—মনে হচ্চে যে এ ভাবটি আমার মধ্যে থেকে যেন কখনো না যায়—অন্য রূপে আর ইষ্টের আবির্ভাবে কাজ নেই, তোমার যে মূর্ত্তি আমি দেখছি আমাব এই রূপই ভালো।

—তোমার এখন যে অবস্থা, এখন জ্ঞানতত্ত্ব আলোচনা নিস্ফল,—তা তোমাব ভাল লাগবে না, তর্কবিতর্কের সময়ও নয়,—তোমার সরল প্রেমপূর্ণ কোমল প্রকৃতি, তাতে ইষ্টের বীজ পড়েছে,—অধ্যাত্ম শক্তিরও বিকাশ হতে আরম্ভ হয়েছে। অন্তরের ভাব-সমুদ্র উদ্বেলিত হয়ে উঠচে, নানাভাবে তোমার অন্তরের যত কিছু কাম্য তারই প্রকাশ হয়ে ক্ষয় হয়ে যাচ্চে। এখন এই ভাবেই তোমায় কিছুকাল কাটাতে হবে। কিন্তু যদি এর মধ্যে তোমার বিশেষ বাসনার স্ফুট না ওঠে তা হলে উচ্চতর গতি পাবে। সে যে কি অপূর্ব্ব আনন্দময় অবস্থা তার তুলনা নেই। কিন্তু এ অবস্থায় যদি কোন বাসনায় প্রবল আকর্ষণে তোমায় টানে, তাহলে, আর উন্নততর গতি তুমি পাবে না—এখনও তুমি স্থূল রাজ্য পেরিয়ে যেতে পারোনি—চিদানন্দেব আভাষ কিঞ্চিৎ পেয়েছ মাত্র। আর এটি না পেরিয়ে গেলে আত্মাব রাজ্যে তোমার গতি নেই। এটুকু-

তোমায় বুঝতেই হবে। ছোট একটি সাধারণ বস্তুর লোভে অমূল্য সম্পদ হারানো হবে না,—আমি তোমায় তা হতে দেবোনা পার্ব্বতী।

১৬

—আজ তুমি যখন নিঃসঙ্কোচে আমায় সব কথা বলতে হুকুম দিয়েছ, আমি তা বোলবো। পার্ব্বতী এখন নিঃসঙ্কোচেই বলিতে লাগিল,—তুমি উড়িয়ে দিওনা যেন নানারকম জ্ঞানতত্ত্বের কথা বোলে। এখন আরও একটা কথা বলি,—তুমি এবারে আমার কাছে যে-রূপে প্রকাশ হয়েছ, আমার মনে হয় তোমার কাছ থেকে আমায় যদি তফাতে থাকতে হয় সেটা আমার পক্ষে মরণের মত হবে। আমি কিছুতেই তোমার কাছ থেকে দূরে থাকতে পারবো না। আমার অধ্যাত্মশক্তি লাভে কোনও দরকার নেই। দেখ, আমি এতদিন জীবন বৃথাই কাটিয়েছি, তুমি এসে আমার জীবন পূর্ণ করেছ,—আমার জন্ম সার্থক মনে হয়েছে তোমার সঙ্গ পেয়ে;—তুমি আর এখন আমায় ছেড়ে যেও না।

—এই ভয়ই আমি পেয়েছিলাম, পার্ব্বতী! তোমায় একটু সহজ ভাবে বুঝতেই হবে, সংসারে স্বামী-স্ত্রীর যে আকর্ষণ, নারী-জীবনকে পূর্ণ করে পুরুষ আর পুরুষ জীবনকে পূর্ণ করে নারী—স্ত্রী প্রকৃতি, বিনা অবলম্বনে থাকতে পারে না,—মানে অবলম্বনই এখন তোমার অধিকারে মুখ ছাড়তে পারে। যা কিছু স্থূল, তা অকল্যাণের আকর, এই দুই জীবনের যে ভোগ তা সৃষ্টিমুখী বলেই প্রকৃতি অনুকূল যোগাযোগ ঘটিয়ে তা সার্থক করেন। কারণ তাতে প্রকৃতির উদ্দেশ্যই সিদ্ধি হয়, আর জীব-সৃষ্টিরই উদ্দেশ্য থাকে তার পিছনে, জানবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তুমি বিধবা, ব্রহ্মচারিণী, তারপর সম্প্রতি অধ্যাত্ম জীবনের আস্বাদন পেয়েছ, দীক্ষিত হয়েছ। আমি আকুমার ব্রহ্মচারী। যদি প্রকৃতির সে উদ্দেশ্য থাকতো তা হলে আমার জীবন-গতি অন্য রকম হোত। আমার জন্মবৃত্তান্ত তুমি জানোনা, জানলে বুঝতে যে আমার জীবন-পথ সম্পূর্ণই পৃথক—এমন ভাবেই স্বতন্ত্র যে তাতে প্রকৃতির স্থূল জীব-সৃষ্টির অনুকূল কোন ভাবই নেই। কাজেই—

বাধা দিয়া পার্ব্বতী বলিল,—তোমার জন্মপত্রিকায় আমার প্রয়োজন নেই, তোমাতে-আমাতে স্বামী-স্ত্রী মিলিত সাংসারিক জীবনেও প্রয়োজন নেই, জীবনসৃষ্টির প্রেরণাও নেই, —শুধু দুজনে কাছাকাছি থাকা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যই যখন নেই তখন আর আমাদের অন্যায় কোথা? তোমার দর্শনে, তোমার সঙ্গ-গুণে আমার শক্তি পূর্ণ মনে

হয়,—আর অদর্শনে এতটা শক্তিহীন, নির্জ্জীব মনে হয় কেন? এটা কি কথায় বা যুক্তিতে উড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপার? আমি ত দেখছি এতেও প্রকৃতির প্রেরণা রয়েছে, তা যদি না হবে তা হলে আমার অন্তরে তোমার অস্তিত্ব এত গভীর হল কি করে? ছয় সাত বৎসরের শিশু হয়ে যখন এসেছিলে, তখন আমিও তাই! কিন্তু আমি কেন তখন থেকেই তোমায় ভুলতে পারিনি। তারপর এবারে তোমায় দেখেই আমার কেন মনে হল যে তুমি আমার ইষ্ট, ভগবান হয়েই এসেছ। আমার সকল দুঃখ দূর করেছ। এখন আমাকে সঙ্গে নিতে তুমি এমন সব কথা বলছ কেন?—আমার দ্বারা তোমার কোনও অনিষ্টের সম্ভাবনা ত আমি দেখতে পাই না।

—দেখ পার্ব্বতী, তুমি শিশুকাল থেকেই শান্ত প্রকৃতি, মুখটি বুজে অদৃষ্টের ফল বোলে অকাতরে সংসারের দুঃখ-কষ্ট সব সহ্য করেছ। বিবাহ হয়েছিল, স্বামী সুখ, স্বামী-সঙ্গ কেমন তা আস্বাদ তোমার ভাগ্যে ঘটেনি। কাজেই দুঃখীজীবনের যে সব অপূর্ণ কামনা তা সমস্তই তোমার অন্তরে সুপ্ত হয়েছিল। এখন আমার আবির্ভাবে, সংসারের অন্নবস্ত্রের যে দুঃখ বোধ, তার উর্দ্ধে উঠেছ;—মুক্তির স্বাদ পেয়েছ। তারপর অধ্যাত্ম-রাজ্যে পরম সুখের আভাস পেলেও, তোমার অন্তরের সুপ্ত বাসনাগুলি—নারী-জীবনের যে সাধ তা পূর্ণ হবার আশায় জেগে উঠতে চাইচে আর প্রচণ্ড শক্তিতে তৃপ্তির উপায় অনুসন্ধানে ছুটচে। আমি ত স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি এ ক্ষেত্রে তিলমাত্র দুর্ব্বলতায় আমাদের পবিত্র জীবনের পরিণাম কি ভয়ানক হবে। তুমি বুদ্ধিমতী, স্থির বুদ্ধি শান্ত প্রকৃতি, নারী হলেও শক্তি তোমার কম নয়। তুমি যদি এ ভাবে আমার আকর্ষণ কর আর আমায় যদি প্রতি পদে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করে নিজের পথে চলতে হয়, তা হলে আমার জীবনের উদ্দেশ্য বিফল হয়ে যাবে। তোমার উপকারের কি এই প্রত্যুপকার? তুমি কি এই ভাবেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে?—

—না না,—তা ঠিক নয়,—তুমি কি সত্য-সত্যই সাধারণ মানুষের মত এমনই দুর্ব্বল-চিত্ত একজন যে—আমার মত একটি ছোট্ট মেয়েমানুষের জন্য তোমায় এতটা দ্বন্দ্বযুদ্ধ করে বাঁচতে হবে,—তোমার শক্তির কিছু পরিচয় আমি পেয়েছি,—আমার মনে হয় না যে, তুমি যা বললে তার শতাংশের একাংশও তোমার লাগবে আমার আকর্ষণের জন্য।

—দেখ, একটা রহস্য তোমায় বলি,—বিবাহিত, ইন্দ্রিয়সুখের কামনা জর্জ্জরিত মানুষে তা জানেনা, কারণ, এই গভীর তত্ত্ব তাদের জানবার সম্ভাবনাই নেই,—আকুমার

ব্রহ্মচারী জীবনেই এর বিকাশ হয়। আমার প্রতি ভালবাসা, এই যে একনিষ্ঠ প্রেম, এটা যদি যথার্থই ইন্দ্রিয়সম্বন্ধশূন্য হয় তা হলে প্রকৃতির অসীম সম্পদের অধিকারী হবে তুমি, তাতে তুমি এই সৃষ্টির যে কল্যাণ করতে পারবে, স্বার্থপর হয়ে নিজ শরীর মনে সুখের লালসা থাকলে তা পারবে না তুমি। দেখ, বিধাতার বিধানে আমিও কুমার, তুমিও কখনো কোন পুরুষের সংসর্গে আস নি, পবিত্র আছ,—এতটা দিন কেটেছে, এখন কত সহজ হয়ে যাবে যদি ঐ লোভ থেকে নিজেকে বাঁচাতে পার। ছোট দিকে লক্ষ্য যাতে তোমার না যায়, আমি তাই এতটা চেষ্টা করছি। কারণ তার ফলে আমরা যে মহান, স্থায়ী, পরমানন্দময় শক্তি লাভ করতে পারবো তাতেই আমাদের জন্ম ও জীবন সার্থক হবেই আর প্রকৃতির একটি মহান কর্ম্ম সিদ্ধ হবে আমাদের দিয়ে।

—প্রকৃতির যে অভিপ্রায়ের কথা বলচ সেটা কি এর মধ্যে নেই। আমার প্রাণ যখন তোমাতে লেগেছে, তখন যদি দুজনে মিলে যাই সে কি করে খাটো হবে তা ত বুঝতে পারিনা।

—যদি সংসারী সাধারণের মত দুজনে ইন্দ্রিয়-সুখের লালসে মিলে যাই তাহলে ঐ সংসারী ছোট জীবের মতই প্রকৃতি আমাদের দিয়ে জীব-সৃষ্টি আর তাদের লালন-পালন করিয়ে নিতেই থাকবেন, আর কোন মহৎ কাজের সম্ভাবনা থাকবেনা। তুমি মেয়েমানুষ, তোমার পক্ষে সেটা খুবই বড় কাজ, কিন্তু আমি তা থেকে যে মহৎ কর্ম্মের সন্ধান পেয়েছি, আমি তোমার উদ্দেশ্যে ভেসে যেতে পারবো না। আর যদি তুমি একটু তুচ্ছ সুখের মোহ ত্যাগ করতে পারো তাহলে তোমার সঙ্গে আমার কখনও ছাড়াছাড়ি হবে না।

—তুমি যদি আমার উদ্দেশ্য ঠিক বুঝে থাক তাহলে কখনই অন্যমত করবে না। তোমার সঙ্গে মিলে যদি আমার জীবন সফল হয়, সার্থক হয় সেটা কি তুচ্ছ? তাতে তোমারও কি লাভ নেই, তুমিও ত সুখী হতে পারবে। দুজনেই ত একাত্মা?—

—না, না, না,—আত্ম-সাক্ষাৎকার না হলে কখনো দুজনে একাত্মা হওয়া যায় না, যদিও আসলে চরম লক্ষ্য আমাদের তাইই বটে। সত্য দর্শন না হলে শুধু জ্ঞানের কথায় কাজ হয়না, যদিও দর্শন বা মিলনের পূর্ব্বে আমরা সময় সময় কথায় ঐ অবস্থার আলোচনা করে থাকি আর মনে করি সেই অবস্থা লাভ বুঝি আমাদের হয়েই গিয়েছে। কতটা ঐকান্তিক যত্ন থাকলে তবে না আত্মরতি হয়,—তার পরেই না নির্ব্বিকল্প সমাধি। এক নারীর এক পুরুষের উপর টান থাকলে, একের আত্মোৎসর্গ আর অপরের তাকে

যে পাওয়া তা সুধু ভাব মাত্র থাকেনা,—কর্ম্মের দিকে টানবেই, এড়াতে গেলে তা পাগলের প্রলাপে পরিণত হয়। কারণ সে টানটা শেষে ঐ নরকের দিকেই এগিয়ে দেয়,—যদিও ঐ ভালবাসা থেকেই মুক্তির পথ। পার্ব্বতী অনেকক্ষণ প্রায় মুদিত নয়নে বসিয়া শুনিতেছিল,—এই পর্য্যন্ত শুনিয়া বলিল,—এখন আর আমি বেশী শুনতে পারবো না,—তোমার কথা বড়ই ভয়ানক,—এত বুদ্ধি তো নেই আমার যে এসব বুঝে নিয়ে সহজভাবে কাজ করে যাব।—এত সহজ নয়, আমাদের চৌদ্দ পুরুষে এ সকলে ধারনার সম্ভাবনাই নেই, তবে আমি যে বসে শুনচি ভাবচি তা তোমার মত একজন মহাপুরুষের সঙ্গের গুণে আর কৃপায়,—আজ থাক এই অবধি। তুমি আমায় যা বলবে তা কখনও আমি বেকার হতে দেবো না। সেদিনের কথা এই পর্য্যন্তই হইয়া রহিল।

১৭

দুই তিন দিন পরে আবার পার্ব্বতী আরম্ভ করিল,—তোমার প্রতি আমার এই ভালবাসার ভাবটি তুমি যে সরল ভাবে নেবেনা, আর এটিকে প্রশ্রয়ও দেবেনা. তা আমি প্রথমেই অনুমান করেছিলাম—তাই এ কথা বলতে আমার এতটা সঙ্কোচ হয়েছিল। পার্ব্বতী—বলিতে লাগিল,—আচ্ছা, এ বিষয়ে তুমি এতটা উতলা হলে কেন আমায় যথার্থ বোলবে? তোমার কথার ভাবে বোধ হয় যে এর মধ্যে একটা খুব বড় অমঙ্গল আশঙ্কা সুধু নয়. তুমি যেন তার সম্ভাবনার আভাসও পেয়েছ।

—আহা পার্ব্বতী,—তোমরা নারী জাতি, জগদম্বার উদ্দেশ্য সাধনের কতটা প্রিয় কতবড় নিপুণ যন্ত্র তা তোমরা জানো না। তোমাদের প্রকৃতিগত কোমল এমন শক্তি, এমনই সহজ ভাবে নিঃসাড়ে একজনকে আক্রমণ করে, তার স্বভাবের ভিতরে দিয়ে এমন কৌশলে অধীন করে ফেলে যে তার ভয়ঙ্কর পরিণামের আভাস মাত্রও গোড়ায় পাওয়া যায়না। অসাধারণ জ্ঞানী সংযতমনা মানুষেও তার বিন্দু-বিসর্গও জানতে পারেনা। হাতি যেমন তার নিজের বিশাল শরীর দেখতে পায় না, প্রকৃতিও ঠিক তেমনি তোমাদের অসীম আকর্ষণী শক্তির ব্যাপারে অন্ধ করে রেখেছেন,—না হলে তাঁর এ সৃষ্টির উদ্দেশ্য পাল্টাতে হ'ত।

—সত্য-সত্যই কি এই ভালবাসার পরিণাম এমন ভাবের হতে পারে যার জন্য তোমার জীবনে অশান্তি আসবে? আমার মনে হয় তুমি একটু বেশী সাবধান হবার জন্যই এটিকে এত ভয়ঙ্কর বোলে আমায় ভয় পাইয়ে দিচ্চ। আমার প্রাণ তোমাতে

অনুরক্ত হওয়াটা, তোমার পবিত্রতা নষ্ট করবে বা তোমার জীবনের উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট করবে একথা কিছুতেই ত আমার মনে নেয় না।

—প্রথমত তোমার এখন অধ্যাত্ম-শক্তির প্রভাব চলচে। অপূর্ব্ব এই বিকাশের সময়। এখন এই বিকশিত অবস্থায় তুমি এতটা উচ্চ ভূমিতে রয়েছ যেখান থেকে কোন অমঙ্গলের আভাস মাত্র পাবার কথা নয়। আত্মা থেকে অন্তঃকরণ দিয়ে তোমার দেহ পর্য্যন্ত পবিত্র একটা জ্যোতির বিকাশ হয়েছে। তোমার এই পবিত্রতার মহিমায় এখন মহা অপবিত্র জীবও তোমার সংসর্গে এলে পবিত্র হয়ে যাবে। এমন কি এখন যদি কোন মহাকামুক যথেচ্ছাচারী নরপশু তোমার এই মূর্ত্তি দেখে, তার মধ্যে পবিত্রতা আসবে,—তার গত জীবনের জন্য অনুতাপ আসবে। আর এই জন্যই আমি তোমায় এখন কিছুদিন এখানেই রাখতে চাই। যাক্ সে সব কথা, এখন আসল কথাটা এই যে এ অবস্থায় তোমার প্রেম নির্ম্মল খাঁটি সোনার মতই নিষ্কলঙ্ক। কিন্তু তোমায় এ অবস্থা থেকে নামতে হবে যে,—তুমি ত সিদ্ধাবস্থায় এখনও আসনি। অনেক ওঠা-নামা আছে। যখন তুমি নিম্ন ভূমিতে, ব্যবহারিক জগতে আসবে, তখন এই ভালবাসার মহিমা এতটা শুদ্ধ না-ও থাকতে পারে। কারণ নারী-জীবনের সকল সাধই ত তোমার অপূর্ণ রয়েছে—নিম্নভূমিতে এলেই তোমার মনে সুযোগ, অর্থাৎ দেশ কাল ও পাত্রের যোগাযোগ ঘটিয়ে সেই সাধ পূর্ণ করবার জন্য তোমায় অন্তরকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করবে।

সেদিন ওই পর্য্যন্তই কথা,—ইচ্ছা করিয়াই অবধুত সেদিন আর ইহার বেশী আলোচনা করিলেন না, অগত্যা পার্ব্বতীও নিরস্ত হইল যদিও অন্তরে তাহার একটা বেগ রহিয়া গেল যেন এখনও তার কিছু মীমাংসা হইল না।

১৮

তার দিন কয়েক পরের কথা,—পার্ব্বতী আপন চিন্তায় সমাহিত,—যেন বাহ্যজ্ঞান নাই, বসিয়া। অর্ক দূর হইতে তাহা লক্ষ্য করিলেন, তবুও তাহার কাছে আসিলেন, ইচ্ছা করিয়াই তাহার সম্মুখেই বসিলেন এবং বলিলেন,—পার্ব্বতী, সংযমের আসল কথাটা তোমাকে বোলতে গিয়ে সে দিন হয়ত তোমার মনে একটা কিছু আঘাত—দিয়েছি,—

বাধা দিয়া পার্ব্বতী বলিল, না, না, তা কেন, তোমার বক্তব্যটা যেন এমন গভীর একটা কিছু, যা বুঝতেও পারিনি আর ইচ্ছাও হয় না বুঝতে। যেন ও সব কুটকচালে ব্যাপার না বুঝলেই সুখ ও শান্তি বজায় থাকে। আমার মনের এই ভাবটি তুমি ঠিক বুঝতে পেরে-

ছিলে, কথাটা সেদিন তাই আর বেশী চলতে দিলে না, শেষে আমি তা বুঝতে পেরে-ছিলাম। যথার্থই তুমি গুরু, পাকা মাঝি, আমার নৌকো বানচাল না হয় সেই জন্য খুব জোরেই হাল ধরে আছো, আমায় ভেসে যেতে দেবেনা। এ আমি বুঝেচি, কিন্তু তবুও আমার মনের গোলমালগুলো কাটাতে, যতক্ষণ না আলো পাই ততক্ষণ তোমায় ছাড়বো না।

অর্ক বলিলেন, আচ্ছা, এটা ত বুঝেছ যে কি ভয়ঙ্কর অবস্থা মানুষ নিজে নিজেই সৃষ্টি করে সামান্য একটু দেহ আর মনের সুখের জন্য। শুনিয়াই পার্ব্বতী বলিল,—সামান্য দেহ-মনের সুখ যাকে বলচ, সেটি তোমার কাছে সামান্য হতে পারে স্বীকার করি, কিন্তু জগৎ জুড়ে ঐ সুখের, ঐ সামান্য একটু সুখের জন্য জীবরাজ্যে কি ভয়ঙ্কর উত্তেজনা, কি উদ্দাম ব্যাকুলতা ; বংশ-পরম্পরায় প্রত্যেক সংসারের প্রত্যেক জীব বাড়বার পথে, মানুষ হবার পূর্ব্ব থেকেই ঐ সুখটুকু পাবার জন্য ছটফট করছে। শুধু তাই নয়—তা না পেলে জন্ম ও ও জীবন বৃথা মনে করছে। এমন একটি প্রাণী দেখাতে পার, যার মধ্যে ঐ সুখের প্রবৃত্তি নেই, বা আকাঙ্ক্ষা রাখে না ?

পার্ব্বতী এ কি ভাবের অবতারণা করিতেছে ?

পার্ব্বতীর ঐ কথা ও ব্যাখ্যা শুনিয়া অর্ক স্থির এমন কি কতকটা স্তম্ভিত হইয়া রহি-লেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁর স্বাভাবিক কোমল কণ্ঠে বলিলেন,—দেখ পার্ব্বতী,—ধন বা অর্থ, যার অপর নাম কাঞ্চন,—এটিও কি ঐ রকম চমৎকার বস্তু নয় ? ঐ অর্থের পিছনে এই পৃথিবীর কোন্ মানুষটি না চলছে,—কে না জানে যে অর্থ ব্যতীত দৈনন্দিন জীবন বৃথা। স্ত্রীসম্ভোগ সুখটা বরঞ্চ দু' দশদিন বা দু' দশমাস বিলম্ব করলে চলে কিন্তু পয়সা না হলে একটা মানুষের একটি দিনও চলে না, এটা ত দেখতে পাও ? ঐ অর্থের সঙ্গেই অন্ন আছে। ঐ অর্থের জন্যই জীব কি ভয়ঙ্কর দায়িত্বপূর্ণ জীবন বহন করছে, অথচ এমন ভীষণ পাপ তুমি কল্পনা করতে পারবে না যা মানুষে অর্থ বা পয়সার জন্য না করে—কেমন ? তুমি কি ঐ অর্থকে পরমার্থের জায়গায় ভাবতে পারো ?

পার্ব্বতীর কোনো উত্তর না পাইয়া অর্ক পুনরায় কহিলেন,—দেখ পার্ব্বতী, স্ত্রী-পুরুষের মিলন আর সংসার-সৃষ্টি,—এটি তোমাদের প্রকৃতিগত সংস্কার। সংসার-ধর্ম্মের নামে তোমাদের মন প্রাণ উদ্দাম হ'য়ে ছুটতে থাকে, আর ওটা না হলেই তোমাদের জন্ম ও জীবন বৃথা গেল মনে হয় আর সেই জন্যই পুরুষের বন্ধনকে দৃঢ় আর ত্বরান্বিত করতে সর্ব্বদাই এগিয়ে যাও তোমরা নির্বিচারে।

পার্ব্বতী : ঐ বাসনা কি সবার বড় নয়?—জগদম্বা কি ঐ বাসনার মধ্যে দিয়ে সৃষ্টির ধারা বজায় রাখছেন না,—তুমি কি মানবের ঐ আদি, অদমনীয়, পরম কল্যাণময় প্রকৃতি-দত্ত মূল বাসনার ধারাটিকে একেবারে বন্ধ করে দিতে চাও?

এতটা শুনিয়া অর্ক বলিলেন,—এসব কি অবান্তর কথা বলচ পার্ব্বতী! পরমা প্রকৃতির সৃষ্টির ধারা বন্ধ করবার কথা আনলে কি বোলে তোমার বা আমার ব্যক্তিগত কথার মধ্যে। আজ আর আমি এসব তর্ক-বিতর্কে সময় নষ্ট করতে পারবো না, আমি চললাম, বিশেষ প্রয়োজন আছে, সময়ান্তরে পুনরায় আলোচনা করবো।

তিনি চলিয়া গেলেন আর পার্ব্বতীও পূর্ব্ব দিনের ন্যায় আবার সচেতন হইল,—তাহার মনে হইল, তাই ত, কি ঐ সকল অবান্তর কথা উঠাইয়া তাঁহার মনে আঘাত দিলাম। সত্যই ত আমাদের প্রকৃতির মধ্যে নিয়তই পুরুষকে বাঁধিয়া সংসারের ঐ গতানুগতিক জীবসৃষ্টির ধারা বজায় রাখা আর নিজেদের ঐ সম্পর্কে ভোগবাসনা চরিতার্থ করা ছাড়া আর কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে, আমরা কতটুকু বুঝি বা কতটুকু অগ্রসর হইয়াছি,—এতটা বুঝিয়াও এমন কথা বলিলাম? বুঝি নাই,—বুঝিবার নামে কল্পনার আভাস পাইয়াছি। ঐ আভাসের প্রভাব কতটা। উচ্চ ভূমিতে আরূঢ় হইয়া আভাসে যে তত্ত্ব অনুভব করিয়াছি৹ উহা এখনও বুদ্ধিগত হয় নাই, তাই এমনটা হইয়াছে,—তিনি স্থিরবুদ্ধি। ঠিক বলিয়াছেন।

দুই তিন দিন আর কোন আলোচনা হইতে দিলেন না, তারপর সুযোগ বুঝিয়া অর্ক একদিন পার্ব্বতীকে লইয়া বসিলেন আর পার্ব্বতী সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল, আমার ভুল হয়েছিল। এখন এটি আমি বুঝেছি যে সৃষ্টির ধারা বজায় রাখবার জন্য প্রকৃতি যে সব জীবের মধ্যে সংসারের নামে ঐ সকল ভোগ-বাসনার প্রবৃত্তি বলবৎ রেখেছেন, যাদের বুদ্ধি ঐ স্তর ছাড়িয়ে আর উঠতে পারে না, আমরা সে স্তরের নয়—উচ্চ তত্ত্বে, সূক্ষ্ম আত্ম-চৈতন্যের প্রসার আমাদের কাম্য, আমাদের লক্ষ্য সমষ্টির পানে এটিও বুঝেছি। কিন্তু আমাদের মনে যদি সংসার-বাসনা না থাকে তবে তোমার সঙ্গে থাকাতে আমাদের সংসার-আবর্ত্তে পড়া বা বন্ধনের ভয় কোথায়? এইটুকুই আমার এখন বুঝতে হবে।

অর্ক হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন,—তোমার মধ্যে কোনো অবস্থায় যদি ঐ বাসনার স্ফূর্ত্তি উঠে তবে ত জগদম্বাই তার যোগাযোগ ঘটিয়ে দেবেন। এতে তাঁর অপরাধ কি, জীবের সাধ বা কামনা পূর্ণ করাই-ত তাঁর কাজ।

পার্ব্বতী : বাসনার স্ফুট্ উঠবেই বা কেন ? সংযম কি আমার মধ্যে নেই মনে কর ? দুজনের মধ্যেই ত তা আছে।

অর্ক : বাসনার স্ফুটের ব্যাপারটা এখনও বুঝতে পারোনি, তাই ও কথা বলছ। দেখ পার্ব্বতী,—এমনি অনেক ভোগ-বাসনা তোমার-আমার মধ্যেই চাপা আছে, আর মাঝে মাঝে তাতে ইন্ধনও পড়ছে নানা যোগাযোগের মধ্যে আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক বা দৈনন্দিন জীবনে। মানুষের মনে এই ভাবেই ভোগ আর কামনার ব্যাপার চলচে। কতকগুলি উঠছে মনের মধ্যে, আবার মিলিয়ে যাচ্চে প্রকৃতির যোগাযোগের অভাবে। কাকেও স্বামী-পুত্র নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর-কন্না করতে দেখে তোমার কি অন্তর থেকে সে-সাধ তীব্রভাবে জেগে ওঠে না ? ওঠে ত ? আবার সেটা অনুকূল যোগাযোগের অভাবে মিলিয়ে যায়। তারপর দেখ, কোন পরিচিত বন্ধু বা আত্মীয় যুবা কারো সঙ্গে সামাজিক ভাবে মেলা-মেশাতে তোমার শূন্য হৃদয়ের মধ্যে তার সঙ্গে ভালোবাসা বা প্রেম জন্মায় না কি ? কিন্তু প্রকৃতির অনুকূল যোগাযোগের অভাবে বা প্রতিকূলতায় সেই সব মিলনের আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে মিলিয়ে যায় ত ? এ সব ত অতি সাধারণ ব্যাপার ;—কিন্তু এরই মধ্যে দিয়েই ত অসাধারণ একটা কিছু ঘটেও যায় !—মনে রেখো আমি অসাধারণ বলছি, অস্বাভাবিক বলিনি। ধরো একটি বিশেষ কামনা যখন একজনের অন্তর ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে ক্রিয়া করে ;—তখন ব্যাপারটা কিরকম হয় তা জান কি ? তার প্রকরণটা তোমায় বলছি,—এটা যোগীরাই ঠিক ধরতে পারেন। মনের মধ্যে সেই কামনার বিষয়, নিরত চিন্তা বা ভাবনার ফলে এক সময় ঘনীভূত হয়, তখনই সেটা হয়, ঐকান্তিক—আর সেই মুহূর্ত্তেই তা থেকে একটি তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন করে,—যোগশাস্ত্রে তারই নাম স্ফুট্। সেটি সূক্ষ্ম একটি তড়িৎ বিন্দুর মতই প্রথমে নাভীকেন্দ্র থেকে উঠে সূক্ষ্ম এক রেখার আকারে তীব্রবেগে হৃদয়কেন্দ্র ভেদ ক'রে প্রাণকেন্দ্রেরও উর্দ্ধে,—একেবারে ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশ করে আর তাই থেকে এমনই এক প্রবল এবং অদম্য ইচ্ছাশক্তি উৎপন্ন হোয়ে হৃদকেন্দ্রে নেমে আসে যে তাইতেই তার উদ্দিষ্ট ভোগটি সম্পূর্ণ করে দেয়। সে শক্তি এমনই উদ্দাম আর এমনই বিষম ক্রিয়াফল উৎপন্ন করে যে, সেই ভোগ-মূলক কর্ম্ম অনিবার্য্য হয়ে ওঠে, যার শেষ না হলে আর নিষ্কৃতি নেই। অবশ্য এটা বুঝেছ যে কাম্য বস্তুর চিন্তা এবং গভীর ভাবনা থেকেই ঐ শক্তির বিকাশ হয়, যার ফলে প্রকৃতি অনুকূল যোগাযোগ ঘটিয়ে তা পূর্ণ করে দিতে বাধ্য হন। বুঝে দেখ,—

প্রাথমিক বাসনাটা, এবং শেষে তা আবার ইচ্ছা শক্তিতে পরিণত হয় জীবের মধ্যে আর তা পূর্ণ হবার নিশ্চিৎ, অনুকূল যোগাযোগ ঘটান জগদম্বা—প্রকৃতি স্বয়ং। এখন বুঝে দেখ, সে শক্তি কতটা দুর্ব্বার যাতে প্রকৃতিকে বাধ্য করে।

পার্ব্বতী যেন তন্দ্রায় আচ্ছন্ন, জড়িত কণ্ঠে বলিল—প্রকৃতিকে বাধ্য করে, এমনই কি শক্তি সেটা-যে প্রকৃতিকে বাধ্য করবে?

অর্ক বলিলেন, ঐ যে কামনার ঘনীভূত অবস্থা নাভি থেকে স্ফুট হয়ে উঠে প্রাণকেন্দ্র ভেদ করে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত তার গতির কথা বলেছি, সেথায় আমাদের আত্ম-চৈতন্য বা ব্রহ্মবিন্দু অবস্থিত, ঐ স্ফুট্ তাঁকে স্পর্শ করে, তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়, তারপর যখন নামে তখন সেটি আত্মার ইচ্ছা হয়েই নামে,-কাজেই সেই ইচ্ছানুরূপ যোগাযোগ মূল প্রকৃতি ঘটাতে বাধ্য। বিদ্যুতের চেয়েও দ্রুতগতিতেই এ সব ভিতরে ঘটে যায়।

শুনিয়া পার্ব্বতী স্তম্ভিত হইয়া রহিল যেন তাহার বাহ্যজ্ঞান কিছুমাত্র নাই। কতক্ষণ পর অর্ক কহিলেন,—তাই বলছিলাম নিম্নভূমিতে নেমে যদি তোমার মনে আমার স্থূল শরীর বা মূর্ত্তি অবলম্বন করে সঙ্গ-কামনা প্রবল হয়, আর তা থেকে কামনার স্ফুট্ উঠে আর ঐ রকম প্রবল ইচ্ছাশক্তি উৎপন্ন করে তার ফলে কোথায় থাকবে তোমার সংযম।

এখন পার্ব্বতী বলিল,—তাহলে যা বুঝলাম সংযম বলে যা কিছু তা ঐ স্ফুট্ ওঠবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত,—স্ফুট্ উঠলে আর কোন সংযমই টেঁকবে না। আসলে ভোগমূলক বাসনাকে মনের মধ্যে আমল দেওয়াই বিপদ;—এতটা ব্যাপার আমি ভাবিনি;—উঃ কি ভয়ানক,—সংযমের গণ্ডি কতটাই সঙ্কীর্ণ তাহলে?

—সঙ্কীর্ণ নয়, সূক্ষ্ম। আর—ঠিক ঐটিই আমি তোমায় বুঝোতে চাইছিলাম প্রথম থেকে। এখন তোমার নিশ্চয়ই সে ভয় নেই, কিন্তু পরে আছে যখন তুমি নিম্নভূমিতে আসবে। যেহেতু তোমার সিদ্ধাবস্থা এখনও আসেনি।

—আচ্ছা তাহলে সংযম ত প্রথম থেকেই ভাল রকমে অভ্যাস দরকার, এ সংসারের সকল দিকেই?

—নিশ্চয়ই,—সেই জন্যই সকলের আগেই হল যম অষ্টাঙ্গ যোগের;—তারপর যা কিছু অন্য।

—কিন্তু আমি তোমার সঙ্গকামনা কি করে ছাড়ব? দোষ কি তোমার সাথে বন্ধুভাবে থাকলে, আমি ত আর সংসার-কামনা করতে যাব না যাতে তোমার অধোগতি হতে পারে?

—আহা, যখনই তুমি নিম্ন ভূমিতে আসবে, সেইটিই যে সংসার-ভূমি, ঐ সব কামনার ক্ষেত্র। সে ক্ষেত্রে যা ভাবনা করবে, তাইত সংকল্প হয়ে দাঁড়াবে। তার উপর তোমার এ আত্মশক্তি তখন পিছনে পড়ে যাবে ক্রিয়া করবে মনের শক্তি। আর মন হল সংসার মুখী,—সে বিষয় ছাড়া আর কিছুই জানে না।

পার্ব্বতী বলিল,—বিষয়? কি বিষয়?—

অর্ক বলিলেন;—তুমি নিশ্চয় অন্যমনস্ক হয়েছ,—তুমিতো জানো;—ইন্দ্রিয় সম্পর্কে যা কিছু গ্রাহ্য, এক কথায় বেদান্ত তাকে বিষয় বলেছেন।

—তোমার অভাবে তোমার চিন্তা আমি ছাড়বো কি করে? পার্ব্বতী বলিল,—বরং কাছে থাকলে, দেখাশুনা সহজ ভাবে হলে তোমার কথা আর চিন্তার দরকার হবে না।

—সে কথাও আমি ভেবেছি;—তবে কিছুদিনের জন্য আমায় যেতেই হবে। তারপর ফিরে এসে দুজনে কাছাকাছি থাকার ব্যবস্থা করতে পারবো। এখন তুমি আমায় ছুটি দাও।

পার্ব্বতী চুপ করিয়া রহিল। অর্ক তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চিন্তিত, যেন একটু ভীতও হইলেন। তিনি জানিতেন নারী-প্রকৃতি বড়ই জটিল। একটু সময় দিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—তা হলে তুমি কি আমায় প্রসন্নমনে বিদায় দিতে পার না?

তাঁহার মনের ভাব ঠিক বুঝিয়া পার্ব্বতী বলিল,—তুমি আমায় কি মনে কর?

—এই সৃষ্টির মধ্যে সৃজন পালন ও ধ্বংসকারী,—জগদম্বার পরমাশ্চর্য্য অপরূপ যন্ত্র মনে করি। যে মহৎ ব্রত নিয়ে আজ এতদিন ধরে এই অকূলে পাড়ি দিচ্চি—তুমি এর সহায়ও হতে পারো, আবার মাঝ দরিয়ায় ডুবিয়েও দিতে পারো।

—বেশ, তুমি আমার গুরু,—আমার উদ্ধারকর্ত্তা, আমার ভগবান্,—আমার সব,—তোমার কোন প্রকার ক্ষতির কারণ আমি হব এ তোমার মনে স্থান পায়?—যতটুকুই হোক আমি তোমার সহায়তা যদি না করতে পারি তবে আমার কি দরকার জীবন-ধারণে। আমি তোমার বন্ধু হবার গৌরবটি ইষ্টলাভের মতই মনে করি। বিশ্বাস হয়েছে?—

এই ভাবে অর্ক বিদায় লইলেন। আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে,—যেই অর্ক তাহার নয়নের অন্তর হইল অমনি তাঁহার মহিমা অন্তরে ফুটিয়া উঠিল;—অবধূতের উপদিষ্ট কর্ম্মের প্রসারতা সে এক নূতন জগৎ তাহার মধ্যে দেখিতে পাইল।

১৮

এক দুই তিন চারটি বৎসর পরে অর্কাবধূত প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ভক্ত অভক্ত সকলের প্রাণেই প্রেম ও আনন্দের বন্যা বহাইলেন। পার্ব্বতী ইতিমধ্যে গুরুর নামটি অবলম্বন করিয়া একটি বিশাল ধর্ম্ম সাধনের ক্ষেত্র প্রসারিত করিয়াছে। ধর্ম্মের নামে স্তোত্রপাঠ ভগবান-ভজন, এ সব নয়,—তাহার সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম হইয়াছিল মনঃ-সংযমের ক্ষেত্রে। যাহা কর্ম্মক্ষেত্রে শক্তি প্রসব করিয়া জাতি বা সমাজকে উন্নত করিবে, সর্ব্বজন হিতার্থ সেই কর্ম্ম যা ব্যক্তিগত নয়। পার্ব্বতী নিজস্থানে এমনই একটি আশ্রয় গড়িয়াছে, যেখানে বালক বৃদ্ধ যুবা, স্ত্রী পুরুষ আসিয়া নির্ব্বিচারে সহজে তাহার ভাব গ্রহণ করিতে পারে। সাধারণের মধ্যে তাহার প্রতি শ্রদ্ধা এবং সহজ প্রীতি দেখিয়া অবধূত বিস্মিত হইলেন। দেবী নামে পরিচিতা পার্ব্বতী যখন ঐ অঞ্চলের মধ্যে কেন্দ্রস্থ শক্তি হইয়া বিরাজ করিতেছে এবং গুরুর নামে সে ঐ অঞ্চলের সকল সমাজের মানুষের হৃদয় জয় করিয়াছে। এই ভাবে সে ব্যক্তিগত কর্ম্মের ক্ষুদ্র গণ্ডি পার হইয়া গিয়াছে সংসারে দুর্ভোগক্লিষ্ট প্রতিবেশী-জনের মধ্যে সরল যুক্তি ও সত্য বুদ্ধির প্রেরণা যোগাইয়া অলস ও অকর্ম্মণ্য জীবনের পরিবর্ত্তে পরিশ্রমের গৌরব জাগাইয়া তাহাদের মনে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছে। সংযমের মাহাত্ম্য সকল বিষয়ে, সকল কর্ম্মেই প্রকট হইয়া তাহাদের জীবনও সুখময় করিয়াছে। ধর্ম্মকে সে অপূর্ব্ব কৌশলে লোকচক্ষে কর্ম্মের মধ্যে, অনলস জীবনের সকল হিতকর প্রচেষ্টার মধ্যে ধরিয়া দিয়াছে—এইটি লক্ষ্য করিয়াই অর্ক স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। সুযোগ মত নির্জ্জনে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন,—পার্ব্বতী, অশিক্ষিতা নারী হয়ে, বিশেষত এতটা দুঃখময় অজ্ঞান সমাজের মধ্যে জন্মে তুমি এই কর্ম্ম ও ধর্ম্মের অপূর্ব্ব সমন্বয়-বুদ্ধি কোথায় পেলে?

পার্ব্বতী অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত উত্তর দিল,—কেন? তুমি আমায় যা দিয়েছ তার মধ্যে কি এটা ছিল না?—শুনিয়া অর্ক বলিলেন, ছিল-ত তার মধ্যে সবই, ব্রহ্মাণ্ডটা ছিল তার মধ্যে,—কিন্তু তার মধ্যে বিশেষ একটির বিকাশের অদ্ভুত মহিমায় আমি বিস্মিত হয়েছি। কোন ক্ষেত্রে কি ভাবে কোন্ বীজের কাজ হয়,—সেই বীজের অধিষ্ঠাত্রী ভিন্ন আর কেহ তা জানেন না, বোধহয় একটা আভাস, অস্ফুট সম্ভাবনা ব্যতীত আমার গুরুও জানতেন না যে কিভাবে আমার মধ্যে তাঁর দেওয়া বীজ উপ্ত হয়ে, কি ভাবে পল্লবিত হয়ে, কি ফল প্রসব করবে। আমার মধ্যে তার সামান্য ক্রিয়া দেখেই চমৎকৃত হয়েছিলেন। কিন্তু তুমি

তাঁর কথা ত কিছুই জাননা, আমি জানি। তাঁর যোগ-শাস্ত্রের যে সকল অসাধারণ আবিষ্কার আছে, যদি তা যথাক্ষেত্রে প্রকাশ করতে পারি যুগান্তর উপস্থিত হবে। যাক্ সে কথা, এখন তোমার মধ্যে এই অপূর্ব্ব বিকাশ লক্ষ্য করে তাঁর চেয়ে কম আশ্চর্য্য হইনি, আমার মধ্যে বিকাশ সম্ভাবনা দেখে তিনি যতটা হয়েছিলেন।

পার্ব্বতী মুগ্ধ ভক্তের মত বলিল,—তুমি শেষ দিন যে বাসনার স্ফুট্ আর সংযমের অদ্ভুত শক্তির কথা বলেছিলে তাইতেই ঐ একমুহূর্ত্তেই আমার মধ্যে বিকাশ হয়েছিল এক তত্ত্ব যার কাজ হল এমনই একটি ধর্ম্ম যা এ পৃথিবীর সকল শ্রেণীর, সকল মানুষের মধ্যে, সকল কর্ম্মের অধিকারীর মধ্যে চিরকাল ধরে দিলেও ফুরোবে না। জগতের যত অলস অকর্ম্মণ্য জড়বুদ্ধি মানুষ আছে,—সকলকেই মুক্ত করা যাবে তাই দিয়ে।

—আমার গুরু, আত্মা থেকে আনন্দ, বিজ্ঞান, মন, প্রাণ আর দেহ পর্য্যন্ত এই যে প্রত্যেক ক্ষেত্রের ক্রিয়া ও তত্ত্ব যোগশাস্ত্রের মধ্যে দিয়ে এমন সহজ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন এর আগে কেউ তা কল্পনাও করতে পারেন নি;—সেই সকল তত্ত্ব যখন প্রচার হবে তখন সারা ভারতের যোগীসমাজ বিস্ময়ে সবাই মুগ্ধ হবেন এবং জেনো, সবাইকে তা নিতে হবে। তোমার যা কিছু লাভ হয়েছে—সে সব তাঁরই সম্পত্তি। আমি একজন মধ্যবর্ত্তী, নিমিত্ত মাত্র।

পার্ব্বতী আনন্দ প্রবাহের মধ্যে স্থির সমাহিত ছিল এখন বলিল,—সত্য সত্যই তোমার প্রসাদ দেখে আমার অন্তর পূর্ণ। মনে হয় কেমন করে আজ আমার মধ্যে এটা সম্ভব হোল? কোথায় ঘুঁটে কুড়িয়ে, দুধ বেচে, খড় কেটে, ক্ষেতি-বাড়ির কাজ করতে দিন কাটাবো, তা নয় আজ আশ্রম করে দেবী সেজে উপদেষ্টা হয়েছি,—আশ্চর্য্য! কিন্তু গুরু স্থানে তোমাকেই রেখেছি,—আর তাই-ই আমার সম্বল। আমাদের গুরুত্বে অধিকার নেই; বিধাতা,—

—গুরু সেই তিনি, সচ্চিদানন্দময়ী পরমা প্রকৃতি,—যাঁর নামের বীজ তোমার মধ্যে পড়ে এত বড় মহৎ ফল প্রসব করেছে। এখন সেটা তুমিও জেনেছ—তোমাতে আমাতে আর গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ নেই,—আমরা আজ এমন অবস্থায় পৌঁছেচি যেখানে উপর নীচে, ছোট বড় আগে-পাছে এ-সব নেই, চৈতন্যের ক্ষেত্রে,—

বাধা দিয়া পার্ব্বতী বলিলেন, চুপ কর তুমি। রক্ষা কর, এখানে আর কেউ নেই কাজেই ব্যাখ্যারও দরকার নেই।

দুজনের মুখেই যেন স্বর্গের অমৃত আসিয়া নামিল। যদি কেহ দেখিত ধন্য হইয়া যাইত।

২০

এমন অবস্থায় কতক্ষণ কাটিয়া গেল, কেহ জানিতেও পারেন নাই, কারণ কালজ্ঞান ছিল না। চৈতন্যের ভূমি হইতে নামিয়া অর্ক মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—পার্ব্বতী! এখন যদি আমি তোমায় নিয়ে কোথায় নির্জ্জনে থাকতে চাই তুমি যেতে রাজী আছ?

পার্ব্বতীর মুখে যথার্থই এক অপরূপ জ্যোতি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল,—তিনি বলিলেন;—এখন আর অমন কৌশল করে বলা কেন? এখনও আমাদের মন চৈতন্যের ক্ষেত্রে একই ভাবে একই তারে বাঁধা রয়েছে, কোন অন্য ভাবের লেশমাত্র লাগেনি কাজেই এখন ও কথা একেবারেই নিষ্প্রয়োজন। তা ছাড়া; নীচে নামলেই তুমি আমার গুরুস্থানে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হোয়ে থাকবে, আমার কোন কাজেই তাহলে আর ভুল হবে না। এখন আমি তোমায় এক প্রশ্ন করব। আচ্ছা বলত, এই যে কর্ম্মক্ষেত্র গড়ছে, ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছে দেখছি, দেখ, আমার আশঙ্কা আছে যদি—

—আমি জানি তোমার ভয়ের কথা,—আরও জানি এই যে কর্ম্মক্ষেত্র যাকে বলছ এটা বাড়ছে আরও বাড়বে, তারপর এর সঙ্গে সঙ্গে আবার লোকনাথের যে কর্ম্মক্ষেত্র গড়ে উঠছে সেটি হবে বিশাল। কিন্তু বিশাল কর্ম্মের ক্ষেত্রে কাজ করতে গেলে, কর্ম্মের যে অবশ্যম্ভাবী নিয়ম তার মধ্যে দিয়েই যেতে হবে আর তার শুভ-অশুভ সকল ফলাফলই মাথা পেতে নিতে হবে। এই সব হিসাব গোড়া থেকেই মনে রাখা উচিৎ—

—আশ্চর্য্য,—শুভ উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করলেও তার ভিতরে অশুভও কিছু থাকে,—যা এড়ানো যায় না।

—দেখ পার্ব্বতী, স্বামী বিবেকানন্দ যখন তাঁর মিশনের কাজ আরম্ভ করেন, তখন তিনি এর সব দিকটাই দেখে পা বাড়িয়েছিলেন। এখানে তাঁর কথা বলছি এই জন্যে যে ভারতের মাটি থেকে বৌদ্ধ ধর্ম্ম নির্ব্বাসনের পর এত বড় কর্ম্মক্ষেত্র আর কেউ গড়েনি,—আর তিনিই এ যুগের পথ প্রদর্শক। দেখো শ্রীরামকৃষ্ণের হাতে তিনি গড়ে উঠেছিলেন, কিন্তু উপাদানটাও তো কম কথা নয়? ঐ সিদ্ধপুরুষের সিদ্ধ সংকল্পবলেই আজ তা ক্রমশ প্রসারের পথেই যাচ্ছে অথচ সুশৃঙ্খলারও অভাব হয় নি। এত বড় কাজের মধ্যেও গ্লানি বা অশুভ কোথাও কোথাও থাকতে পারে কিন্তু এই বিরাট সৃষ্টির মতই তাতে

সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম ও শৃঙ্খলায় অভাবে এ ধারা ম্লান হয়নি বা হবেও না। কারণ সকল কর্ম্মের মধ্যেই যতক্ষণ কেন্দ্রের প্রাণশক্তি বর্ত্তমান থাকে, ততক্ষণ সে কর্ম্ম প্রসারিত হতে বাধ্য। সেই প্রাণশক্তি হল প্রকৃতির অনুমোদন,—আর সেই অনুমোদন দেশবাসী জনগণের অনুমোদন। জনসমাজকে নিয়েই ত কর্ম্মক্ষেত্র ? যতক্ষণ তা দেশের বা দশের যথার্থ কল্যাণ করতে পারবে ততক্ষণ তা অমর। এই হল সকল প্রতিষ্ঠানের সার কথা।

—লোকনাথের কর্ম্মক্ষেত্র কি বলছিলে ?

যখন বৃন্দাবন থেকে নানা স্থান ঘুরে প্রথমবারে এখানে আসি তোমার কাছে,—তখন লোকনাথ চক্রবর্ত্তী বলে সরকারী পেন্সন প্রাপ্ত উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী একজন, অসাধারণ ধীমান সেই প্রথম আমাকে একদর্শনেই আপন করে নিয়েছিল। তার অতি উচ্চ অবস্থা,—যথার্থই ভগবদ্ভক্ত, দেশের দুর্গতিতে ব্যথিত হয়ে একটা কিছু করতে চায় যাতে দেশের কল্যাণ হয় আর মৃত্যুর সময় মনের সন্তোষ থাকে। যদিও তাব প্রৌঢ় বয়স তবুও দেখেছি অসাধারণ কর্ম্মশক্তি তার মধ্যে সুপ্ত রয়েছে,—আর বিকাশের পথ খুঁজছে ;—এমনই সময়ে আমার সঙ্গে তার দেখা। আমাকে ধরে সে কিছু গড়তে চায়। শক্তি তার, কর্ম্ম তার, সবই তার কেবল তার এমন একজন চাই যে তাকে উদ্বুদ্ধ করবে। তার পবিত্র অন্তর আর পবিত্র সংকল্প দেখে আমিও প্রেরণা পেয়েছি তার উপদেষ্টা হতে। এ সবই তাঁর যোগাযোগ।—দেশের মধ্যে বন্যা এসেছে—আমারা নিমিত্ত হয়ে লেগে যাব। ইতিমধ্যে সে কিছু মূলধনও যোগাড় করেছে, আরও পাবার আশাও পেয়েছে,—সংগ্রহ চলছে। কিন্তু দুঃখের কথা তার একজন প্রিয়বন্ধু, যার কাছ থেকেও থোকটাকা কিছু সে পেয়েছে,—সে ব্যক্তি তাকে পরামর্শ দিয়েছে যে নিজের দেশে, বাঙ্গলায় গিয়ে এই ক্ষেত্রটি গড়তে যাতে বাঙ্গালীর উপকার হবে। তাই আমার কাছে এসেছিল পরামর্শ নিতে।

—তুমি কি বললে ? পার্ব্বতী আকুল উৎকণ্ঠা লইয়াই কথাটা জিজ্ঞাসা করিল।

—আমি বললাম,—বাঙ্গলা বিহার, নিজের দেশ পরের দেশ এই সব নিয়ে যদি কাজ করতে হয়, তা হলে আমার কাছে তুমি এসোনা লোকনাথ। আমার ব'লতে কোন নিজের দেশ যখন নেই আমার সে বিষয়ে তোমায় পরামর্শ দেওয়া ভণ্ডামী হবে। তুমি আমায় রেহাই দাও। এক কথায় জগদম্বার ইচ্ছায় চৈতন্য হয়ে গেল, সে বললে ক্ষমা করুন, আমার ভুল বুঝতে পেরেছি।

পার্ব্বতীর মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল কিন্তু তখনি আবার ম্লান হইয়া গেল, তিনি বলিলেন,—

তাহলে তুমি কাজ আরম্ভ হলেই আবার চলে যাবে ত? তোমার নিরুদ্দেশ হওয়াটা যেন আমি দেখতে পাচ্ছি।

—হাঁ, আমি ত সব দিক দিয়ে বরাবরই নিরুদ্দেশেরই আসামী। দেখ পার্ব্বতী, এক অপূর্ব্ব রহস্য আমার জন্ম জীবনের কথা, কাকেও বলিনি। প্রথমে আমার জন্মদাতা ও জননীর উদ্দেশ নেই, তারপর লালন পালন এক স্নেহময় বৈষ্ণের ঘরে,—তার পর থেকেই আমি ত জগৎ সংসারের কাছে নিরুদ্দিষ্ট হয়েই আছি। সমাজ-সংসার ও জাতি-ধর্ম্মের কাছে আমার কোনও সন্ধান নেই—কেবলমাত্র তোমার সঙ্গেই আমার সম্বন্ধ।—তারপর লোকনাথ,—প্রীতিতে আমায় বেঁধেছে সে, যা কাটাতে পারিনি, ইচ্ছাও হয় না। এটাকে অধ্যাত্ম সম্বন্ধ বল, যাই বলো না কেন—এইটিই আছে আমার। এখন আর কি—

—একদিন তুমি কি দেখাবে বলেছিলে গঙ্গার ধারে—

—হাঁ, চল, আজ যদি সময় থাকে তোমার, সে স্থান দেখাবো,—পঙ্কু নামে সাতবছরের শিশু হয়ে যখন এখানে এসেছিলাম এ তখনকার ঘটনা। আমার জন্ম ও পূর্ব্ব-জীবন-কথা সব কিছুই বলব, যা কখনও কাকেও বলিনি। বোধ হয় এখন সময় হয়েছে তোমাকে তা জানাবার।

—তুমি গঙ্গার ধারে যাও, আমি কিছু কাজ সেরে একটু পরেই আসছি। এই বলিয়া পার্ব্বতী দ্রুতপদে চলিয়া গেল,—অবধূতও গঙ্গার ধারে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

কি জানি কোথা হইতে সেই সময়ে দুই তিনটি ঐ দেশীয় বিহারী ভদ্রলোক আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।

অর্ক জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনারা কোথা হ'তে, আর কার কাছেই বা এসেছেন? তাহারা একবার ভাল করিয়া তাঁহার অপরূপ লাবণ্যমণ্ডিত মুখের দিকে চাহিয়া তারপর সংযত কণ্ঠে বলিল,—আমরা বোধ হয় ভুল করিনি,—আপনার কাছেই এসেছি। অনেক দূর,—কহলগাঁও থেকেই আসছি, সেইখানেই আমাদের বাস। আপনার কথা আমরা অনেক শুনেছি, আর আপনার দ্বারাই আমাদের মহা উপকার হবে;—তবে যে কথাটি আমরা জানাতে সঙ্কুচিত হচ্চি সেটি এই যে আজ এখনই আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। না গেলেই নয়—

এই আকস্মিক ঘটনায় অবধূতকে কিছু ভাবিত করিল;—তিনি ভাবিতেছিলেন, এক নূতন কর্ম্মচক্রের গূঢ় সঙ্কেত না কি।

তাহারা বলিতে লাগিল,—

প্রায় পনেরো কুড়ি বৎসর হোল আমাদের গ্রামে একজন বাঙ্গালী তান্ত্রিক, নামটি তাঁর করালী ভৈরব,—এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আমরা গঙ্গার ধারে তাঁকে জায়গা-জমি প্রভৃতি দিয়ে তাঁর আশ্রম গড়তে সাহায্য করেছিলাম। সেখানে এতদিনে তাঁর অনেক শিষ্য সেবকও হয়েছে। খুব গম্ভীর মানুষ তিনি; বেশী কথা কইতেন না, আর,—কাকেও আশ্রমের ভিতরে নিজের ঘরে ঢুকতেও দিতেন না। আশ্রমের বাইরে একটি চালাঘর তৈরী হয়েছিল সেইখানেই তিনি দিনমানে থাকতেন। যা কিছু শিক্ষা-দীক্ষা উপদেশ ঐ খানেই। একটি ভৈরবী ছিল, তিনিও বেশ ভালই ছিলেন,—প্রায় দু' আড়াই মাস আগে তাঁকে তাড়িয়েছেন। তারপর আজ প্রায় পনের কুড়ি দিন তিনি শয্যাগত। তাঁর যে কি অসুখ, ওখানকার ডাক্তার বৈদ্য কেউ বুঝতে পারেনি। ক্রমশ ক্ষীণ হয়েই যাচ্ছেন। ঐ রকম কঠিন অবস্থা,—আজ তিন চার দিন আমরা মহা উদ্বিগ্ন চিত্তেই কাটাচ্ছি। এখানকার পার্ব্বতী মায়ের এক ভক্ত, মাঝে মাঝে ওখানে তাঁর আশ্রমে আসতো। গত পরশু দিন সে ব্যক্তি ওখানে গিয়েছিল। সেদিন, সেই ব্যক্তি,—পার্ব্বতী মায়ীর গুরু এসেছেন, এই খবর তাঁর কাছে দেওয়ার পর থেকে তিনি কেবলই বলছেন, আমি আর বাঁচবো না, তোমরা যেমন করে পারো তাঁকে নিয়ে এসো। আমরা প্রথমে অতটা মন দিইনি তাঁর কথায়। কাল কিন্তু বললেন যে, মরণের আগে তোমরা একবার তাঁকে এনে আমাকে দেখাও, নাহলে আমার গতি হবে না। একবার গিয়ে আমার অবস্থার কথা তাঁকে নিবেদন কর, তিনি মহাপুরুষ, নিশ্চয়ই আসবেন, শুনলে কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারবেন না। তোমাদের আর কিছু বলবার দরকার হবে না। যাও, আমি তোমাদের আশাপথ চেয়ে রইলাম। এখন কি অনুমতি হয়, আজ্ঞা করুন। নৌকা প্রস্তুত।

ইহাদের কথা শুনিয়া অবধুত কি ভাবিলেন। তারপর তাহাদের অপেক্ষা করিতে বলিয়া পার্ব্বতীর কাছে গিয়া সকল সমাচার দিলেন। শেষে বলিলেন, দেখ পার্ব্বতী, বিধাতার অভিপ্রায় কি জানি না, কিন্তু আমার মনের মধ্যে জগদম্বার একটি সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ পেয়েছি,—আমায় যেতেই হবে।

পার্ব্বতী বলিলেন,—কিন্তু তোমার ফিরে না আসা পর্য্যন্ত আমি উদ্বেগের মধ্যেই রইলাম।

যখন অর্ক নৌকায় পা দিলেন, তাঁর দক্ষিণ বাহুর উপরস্থ পেশীগুলি স্পষ্টই দুই তিনবার কাঁপিয়া উঠিল।

২১

ফহল গাঁওয়ে করালী ভৈরবের আশ্রম ও-অঞ্চলে বিশেষ পরিচিত। নদীতীরেই একটি উদ্যানবেষ্টিত আশ্রম, সত্য বড়ই মনোরম। অর্কাবধূত পৌঁছিয়া যখন সেই উদ্যানে প্রবেশ করিলেন, তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে। বাহিরের চালায় আট দশজন বসিয়া,—সকলের মুখেই উদ্বেগের ছায়া। পীড়িত ভৈরবের জন্য সকলেই চিন্তিত। অবধূতের আবির্ভাব দেখিয়াই তাহারা সকলে তটস্থ হইয়া তাঁহাকে আশ্রমের ঘরের দিকে লইয়া চলিল। চারিদিকেই বেশ প্রশস্ত বারান্দা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। একখানি ঘরে খাটিয়ার উপর ভৈরব করালী শুইয়াছিলেন,—এককোণে দীপ জ্বলিতেছিল।

অবধূত প্রবেশ করিতেই, বড় কষ্টে ভৈরব ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। দীর্ঘ শরীর অত্যন্ত রোগা, যেন ক্ষীণ চর্ম্মাবৃত কঙ্কাল একটি। মাথায় জটার ভারী বোঝা একটি মোটা পাক দিয়া বাঁধা। উজ্জ্বল বড় বড় চক্ষু; দেখিলেই মনে হয় সারা দেহের প্রাণটা যেন চক্ষেই কেন্দ্রস্থ হইয়াছে। ভৈরবের চক্ষুর দিকে লক্ষ্য পড়িতেই আবধূতের দক্ষিণ চক্ষু আবার নাচিয়া উঠিল; এক অদ্ভুত স্পন্দন অনুভব করিলেন তাঁহার হৃদয়ে; সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, এ মুখ যেন অতি পরিচিত, এ চক্ষু কোথায় দেখিয়াছি। দেখিয়াছি, এবং নিশ্চিৎ দেখিয়াছি! কিন্তু চিত্তের মধ্যে কোথায় যে ঐ চক্ষু দুটি গভীর ভাবে আঁকা আছে তাহার নির্দ্দেশ মিলিতেছে না। এই ভাবে অন্তরের মধ্যে কোথায়, কোথায়, করিতে করিতে স্মৃতির আলো উদ্দীপ্ত হইতেই নির্দ্দেশ মিলিল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া হৃদ্‌পিণ্ড সজোরে ক্রিয়া করিতে লাগিল। তিনি চমৎকৃত হইলেন! কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে ঐ শরীরে—তাহাই ভাবিতে ভাবিতে তিনি ভৈয়বের দিকে অগ্রসর হইলেন; মুখে মধুর হাসি আর নয়নে করুণার ধারা বহিতেছে। ভৈরব ঐ পবিত্র মুখের দকে চাহিয়া মুগ্ধ হইলেন। যেন তাঁহার শুভদিন সমাগত, এই ভাবে ব্যথিত অন্তঃকরণ পূর্ণ হইল;—কিন্তু মুখে তাঁহার বাক্য সরিল না, এমন কি তিনি নমস্কারাদি প্রাথমিক সম্ভাষণও ভুলিয়া গেলেন।

তাঁহার ভাবটি লক্ষ্য করিয়া অবধূত কোমল কণ্ঠে কহিলেন, কে, অনাদি নয়? যেন কত প্রিয়জন। শুনিয়াই ভৈরব চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার মুখের ভাব নিমেষেই পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল,—শেষে তাহা সামলাইয়া বলিলেন,—আপনি,—আমায়—আপনি কি—জানতেন? তারপর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই উপস্থিত যে সকল ব্যক্তি সঙ্গে ছিল, তাহাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, এখন তোমরা বাইরে যাও, প্রয়োজন হলে আসবে।

তাহারা প্রস্থান করিলে ভৈরব করালী, অবধূতকে খাটিয়ার পাশেই একখানি চৌকীতে বসিতে অনুরোধ করিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি আমায় জানতেন? কোথায় দেখেছিলেন, আমি তো স্মরণ করতে পারি না।

অবধূত বলিলেন,—জানতাম, একটি রাত্রে দেখেছিলাম মাত্র, ভাগলপুর গঙ্গার ধারে প্রায় ত্রিশ বৎসর আগে, এক কাপালিকের আশ্রমে।

ভৈরব স্তম্ভিত— অধরোষ্ঠ অনেকটাই পৃথক হইয়া মুখ—হাঁ হইয়া গেল।

আপনি কি সেই ছেলেটি, সিদ্ধাইয়ের জন্য কাপালিক যাকে কিনেছিলেন?

মধুর হাসিয়া অর্ক বলিলেন,—ঠিক! সেই, সেই-ই বটে। শুনিয়া ভৈরব যেন নূতন বিস্ময়ে স্তম্ভিত এবং কতক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন; মুখে কথা বাহির হইল না। ভাবটা প্রশমিত হইলে ধীরে ধীরে কহিলেন,—কি আশ্চর্য্য,—মা জগদম্বার কি অদ্ভুত লীলা,—অপূর্ব্ব এ যোগাযোগ! সে রাত্রের সকল কথা স্মরণ আছে?—আজ ত্রিশ বৎসরের কথা! শুনিয়া অবধূত কহিলেন, স্পষ্টই মনে আছে, যেন গত কাল রাত্রের কথা! সে কথা কি ভুলে যাবার?

ভৈরব। সেই প্রকাণ্ড সিন্দুক, মনে আছে?

অর্ক। আছে বৈকি!

ভৈরব বলিলেন,—আর তার মধ্যে মোহরের ঘড়া, সারি-সারি?

অর্ক। লাল চেলীর কাপড়ে মুখ ঢাকা,—

ভৈরব। আর লক্ষ্মী-কৌটার মত একটি রেশমের কাপড়-ঢাকা, যে-টি তখন খুলিনি?

অর্ক। হাঁ, সে কথাও মনে আছে, মন্দিরের চূড়ার মত তার ঢাকনটি,—

শুনিবামাত্রই ভৈরব উঠিয়া বসিলেন। যে লোক ছয় মাস শয্যাগত,—এমন কি কিছুক্ষণ পূর্ব্বেও একজনের সাহায্য ব্যতিরেকে উঠিতে কষ্ট অনুভব করিতেছিলেন, এখন কি শক্তিতে হঠাৎ বসিলেন, তারপরে পা দুটি বাড়াইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; আর যেন তাঁহার কোন অসুখ নাই। একটা আবেগে বা উত্তেজনাবশেই তাঁহার এই গতি লক্ষ্য করিয়া অবধূত,—তাঁহাকে সস্নেহে ধরিলেন। ও কিছু না, কিছু না, বলিয়া তিনি চলিয়াছেন,—কিন্তু দুর্ব্বলতা হেতু পা কাঁপিতেছে। ফিরিয়া আলোর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—আলোটা। অবধূত তাঁহাকে ছাড়িয়া আলোটা লইয়া আসিলেন।

মাঝের দ্বার অতিক্রম করিতেই পাশের ঘরে সেই বিরাট প্রাচীন সিন্দুকটি দেখা গেল।

সেটি অবধূতের পরিচিত। নিকটে আসিয়া ভৈরব বলিলেন,—আর একবার সেই রাত্রের মতো—আলোটি তুলে ধরুন। অবধূত তাহাই করিলেন। ভৈরব চাবী বাহির করিলেন, তালা খুলিয়া, বিশেষ চেষ্টায় ডালাটা তুলিয়া ধরিলেন।

ভিতরে ঠিক সেই সকল দ্রব্য, সেই ভাবেই রাখা আছে। করালী ভৈরব বলিলেন,—ঠিক যেমন দেখেছিলেন, সব জিনিষ ঠিক তেমনিই আছে। তারপর এক কোণ হইতে একটি পুঁটুলি বাহির করিয়া তাহা খুলিতেই সেই লক্ষ্মী-কৌটাটি বাহির হইয়া পড়িল, মন্দিরের চূড়ার মতন যাহার ঢাকন। উহা অবধূতের হাতে দিয়া, এবার ভৈরব নিজ হাতে দীপটি লইয়া বলিলেন, ওটি খুলুন। উহা খুলিতেই,—যে বস্তু তাঁহার চক্ষে পড়িল তাহা হইতে—চক্ষু ফেরানো অসম্ভব। এক বিঘৎ পরিমাণ উজ্জ্বল সুবর্ণময় ষঠকোণ ক্ষেত্রে একটি অপরূপ মণিময় যন্ত্র। সমবাহু ছয়টি ত্রিভুজ; কেন্দ্রে ষট্‌কোণ বিশিষ্ট,—প্রশস্ত ক্ষেত্রের মধ্যে একখানি প্রকাণ্ড
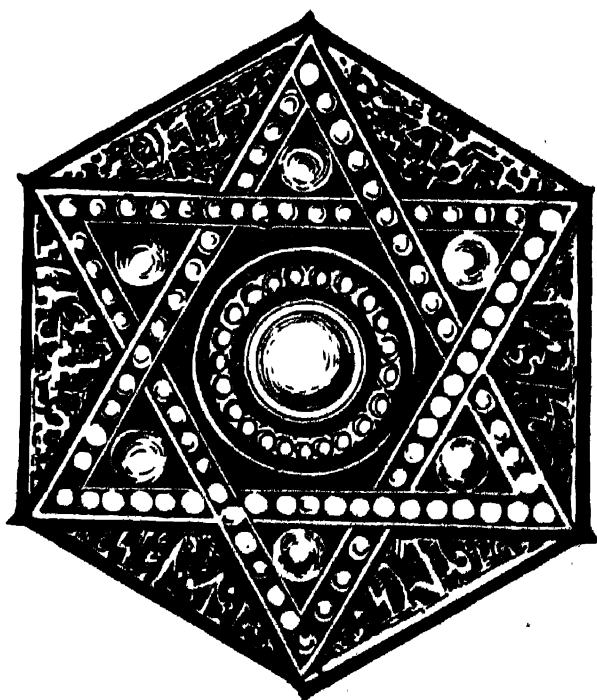
মাণিক। এমনিই উজ্জ্বল, তাহার রক্ত আভার আকর্ষণ, না দেখিলে ধারণা হয় না। প্রত্যেক ত্রিকোণের মধ্যেও মাণিক একখানি—সমস্ত লইয়া যেন একটি তারকার আকৃতি। উহার

বিশেষত্ব এই যে প্রত্যেক ত্রিকোণ ক্ষেত্রে যেখানে যেখানে মাণিক, তাহার—চারিধারেই এক দিকে ছোট বজ্রমণি অর্থাৎ হীরা বসানো, কেন্দ্রের অপরদিকে রক্তমুখী নীলামধ্যস্থ ঐ মণিকে বেষ্টন করিয়া আছে। কেন্দ্রের বড় মণিটি প্রায় একটি পয়সার আকৃতি, ঐ যন্ত্রের বাকী স্থানটুকুতে নানা অক্ষর খোদিত। অর্ক বুঝিলেন—উহা তিব্বতী অক্ষর, তান্ত্রিক সাধনের পরম গুহ্য তারার বীজমন্ত্র কয়েকটি।

এই অদ্ভুত যন্ত্র দেখিয়া অর্ক, বিস্ময়ে অবাক হইলেন। ভৈরব বলিলেন,—আমি ইহার কিছুই জানি না, বুঝি না; যদিও আমার বোলেই এটি বহুকাল, প্রায় আঠারো বৎসরকাল রক্ষা করছি। এটি, কি মনে হয় আপনার, কোন অলঙ্কার কিম্বা অন্য কিছু?

অর্ক বলিলেন, একটি তান্ত্রিক সাধনার যন্ত্র এটি, তারা উপাসক যিনি, তার জন্যেই এই সিদ্ধ যন্ত্র। আপনি যাঁর কাছে পেয়েছেন তিনি বোধ হয় তারা-উপাসক ছিলেন। এটি, খুব সম্ভব তিব্বৎ থেকেই এসেছে, এ বস্তু এদেশে জন্মায় না। ক্ষেত্রের অক্ষরগুলি সবই তারার বীজমন্ত্র—তিব্বতীভাষায় খোদাই করা।

ভৈরব বলিলেন,—পাছে লোভে পড়ে কোন দুর্ঘটনা ঘটে সেই ভয়ে এতদিনের মধ্যেও আর কারো কাছে বার করিনি। সেই কাপালিকের কাছে এটি তাঁর মৃত্যুর ঠিক আটদিন আগে এসেছিল। তারপর থেকেই আমার কাছে এতদিন কাট্‌লো, এখন এ আপনার। সুধু এটি নয়,—ঐ সিন্দুকে যা কিছু আছে, এখন সবই আপনার। আপনিই এর মালিক,—আমার কাজ শেষ—হয়েছে; রক্ষকমাত্র ছিলাম, এতে আর কোন অধিকার আমার নেই। আমি আর—বাঁচবো না।

২২

শুনিয়া অবধুত বলিলেন,—আমি ভিখারী, পথের মানুষ, এ সব তো আমার জন্য নয়! তবে এই সিদ্ধ যন্ত্রটি আর আপনার কাছে থাকা উচিত নয়, তাতে আপনার অকল্যাণ হবে। এটি এখন আমার কাছেই থাক। বলিয়া যন্ত্রটি নিজের কাছে রাখিলেন। ভৈরবও অন্তরে যেন একটা প্রবল স্বস্তি অনুভব করিয়া বলিলেন:

এই সিন্দুকে আছে পুঁথিপত্র, বারোটি মোহরের ঘড়া—আড়াই হাজার করে প্রত্যেকটিতে আছে,—আর ঐ পুরানো মুশলমানী আমলের আকবরী মোহর, বোধ হয় এখনকার ২২৲ টাকা তোলা হিসাবে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ টাকা হবে প্রত্যেকটি;—এসব আপনাকে নিবেদন

করেই নিশ্চিন্ত হলাম, যা ইচ্ছা তাই করুন এ-নিয়ে, বলিয়া সকল কিছু যথাস্থানে রাখিয়া সিন্দুক বন্ধ করিলেন। তারপর দুজনে আসিয়া এ ঘরে বসিলেন।

আসন গ্রহণ করিয়া ভৈরব বলিলেন,—এই ঘরে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে আপনার মাহাত্ম্য আমি বুঝেছি, অশুভ যা কিছু দুর্ভাগ্য আমার তখনই কেটেছে। আজ ছ' মাস শয্যাগত, আপনাকে খুঁজেছি, পার্ব্বতী মায়ের সিদ্ধগুরু বলেই খুঁজেছি ; জানতে পারিনি আপনিই সেই বলির শিশু—আমাকে মুক্তি দিতে এসেছিলেন সেই দিন, কাপালিকের পৈশাচিক দাসত্ব থেকে। বলি দেবার জন্যই ঐ শিশু আপনাকে আনা হয়েছিল কিন্তু, কি যে অদ্ভুত ব্যাপারই ঘটল সে রাতে, মনে আছে তো ?

অর্ক অবধূত নামে আপনিই যে সেই শিশু তা জানবার আগেই কিন্তু মহামায়ার প্রত্যাদেশ জেনে এই সবই মনে মনে রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে, আপনাকেই উৎসর্গ করে-ছিলাম, এখন আপনাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করে, আপনার হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হোলাম। এ ভাণ্ডার থেকে কিছুমাত্র অপচয় করিনি ; কারণ প্রয়োজন হয়নি। কেবল এই মোহরগুলির মূল্য কতটা, 'কষে' দেখেছিলাম। প্রত্যেকখানি প্রায় দুতোলা করে। এই কহল গাঁয়েতে আসবার পর থেকে আমার অনেক ধন, অনেক কিছু বৈভব নিজের অধিকারে এসেছে এখানকার শিষ্যসেবকদের দয়ায় আর শ্রদ্ধায়। আমার দারিদ্র্য নেই, কোন অভাবই নেই। আগে আগে বড় লোভই হয়েছিল যে কাপালিকের এই অতুল ধন সম্পত্তি নিয়ে কত কত ভোগের সাধ মেটাবো। কিন্তু তখন এটা বুঝিনি যে এ ধনের অধিকারী আমি নয়। তখন থেকে কোন অবস্থায়ই এব কিছুই স্পর্শ করতে হয়নি। এখন বুঝেছি আপনার হাতে তুলে দেবার জন্যেই আমায় এতকাল এসব যক্ষের মতই আগলে থাকতে হয়েছে। জগদম্বার কি অদ্ভুত কৌশল মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেচি। এখানে এসে পর্য্যন্ত কাকেও এঘরে ঢুকতে দিইনি।

অবধূত বাল্যাবধি মহামায়াব কত লীলা, কত রহস্যনিগূঢ় যোগাযোগ, নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কতভাবেই না তাঁহার কল্যাণময় নিয়ম ও নিয়ন্ত্রিত্বের পরিচয় পাইয়া ধন্য হইয়াছেন। এখন এই অচিন্ত্যপূর্ব্ব যোগাযোগের ব্যাপারটি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। কত কত তত্ত্ব এই ব্যাপারকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার অন্তঃকরণ মধ্যে প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। ত্যাগীর কাছেই তাঁর ধন-ভাণ্ডার আসিয়া উপস্থিত হয়। এ জগতে, তাঁর ধন, কি ভাবে শক্তিরূপে প্রবাহিত হইয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ কত কর্ম্ম সম্পন্ন

করাইতেছে। একজনের উপার্জ্জিত ধন তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে করিতে আর এক-জনের অধিকারে যাইয়া উপস্থিত হইতেছে। অর্থ শক্তির জটিল এই চক্রগতি। এই-ভাবে জগতে, ধনলক্ষ্মী নিরন্তর অপ্রতিহতভাবে জগত-সমাজের মধ্যে প্রধান শক্তিরূপে বর্ত্তমান, তাই চঞ্চলাকে কেহ নিরবচ্ছিন্ন ধরিয়া রাখিতে পারে না। অথচ অধ্যাত্ম-রাজ্যে ইহার সার্থকতা নাই। বাহ্য জগতে জীবের মনেই ইহার অস্তিত্ব; মন-রাজ্যের বাহিরে ইহার কোনও অস্তিত্ব নাই। একজনের মনোরাজ্যে কামনার মধ্যেই ইহার স্থিতি আর সার্থকতা।

এই বৈভব, মোহময় সোনার মোহর পূর্ণ কলসগুলি, যাহার অণুপরমাণুতে কে জানে কত কালের কত ভোগ বাসনা—কত কত আশা আকাঙ্ক্ষা-সংলিপ্ত,—কি উদ্দেশ্য বিধাতার,—এই লোভ মোহ-মাখানো বহু সহস্র, স্বর্ণময় শক্তিখণ্ড তাঁহার অধিকারে ফেলিয়া দিবার? অবধূত ভাবিতেছিলেন, কি করিবেন তিনি এই ধনসমষ্টি লইয়া, ইহার সদ্ব্যবহার কি ভাবে হইতে পারে—? লোকনাথের ঐ বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র গড়িয়া উঠিতে সহায়তা করিবে এই ধন। কত কাজ হইবে,—কত প্রাণীর অন্ন-বস্ত্র, কর্ম্মপ্রবৃত্তি, কত উদ্যমের পুরস্কার, মনুষ্যত্ব-উপার্জ্জনের পন্থা তথা বহুধা বিচ্ছিন্ন সমাজকে একতায়, একসূত্রে বাঁধিতে সহায়তা করিবে এই ধন,—জগদম্বার সৃষ্ট এই মানুষ-সমাজেই—কল্যাণের সহায় হইবে,—তাই নূতন এক কর্ম্মপ্রবাহ সৃষ্টি করিতে আসিতেছেন চঞ্চলা—এইভাবে শক্তিরূপে।

অবধূতকে চিন্তিত দেখিয়া ভৈরব ভয় পাইলেন, অতি দীনভাবে তিনি বলিলেন,—প্রভু! আমায় নিরাশ করবেন না। আমার এই মরণাপন্ন অবস্থায় আপনাকে পেয়ে ধন্য, পূর্ণকাম হয়েছি; আর আপনার হাতে এ সব তুলে দিয়ে আরামের নিঃশ্বাস ফেলবার জন্যই আপনার উত্তরের অপেক্ষায় প্রতি মুহূর্ত্ত উদ্বেগে কাটাচ্ছি।

তাঁহার উদ্বেগ দেখিয়া করুণাময় অর্ক, ভৈরবের একখানি হাত তাঁর দুটি হাতের মধ্যে লইলেন। অবধূতের মুখে কথা নাই; কি জানি তাঁহার হাতের মধ্যে কি ছিল, ভৈরবের শরীর জুড়াইয়া গেল। তাঁহার প্রাণের ভিতর কেমন করিয়া উঠিল,—ক্রমে তাঁহার চক্ষুও জলভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। অবধূতের স্নিগ্ধ মূর্ত্তি, ভালবাসাপূর্ণ নয়নের দিকে চাহিয়া, জীবনে যাহা কখনও হয় নাই তাহাই হইল,—তাঁহার চক্ষু দিয়া টপ্ টপ্ জল পড়িতে লাগিল। অবধূত সেই ভাবেই তাঁহার হাতে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিলেন, কোন কথাই কহিলেন না,—কিন্তু করালীর কণ্ঠে তখন বাক ফুটিয়াছে,—

গদগদ কণ্ঠে ভৈরব বলিতে লাগিলেন,—সেই—ভয়ঙ্কর রাতের কথা,-কাপালিকের সিদ্ধির দিন, আপনার সেই সৌম্য পবিত্র শিশু মূর্ত্তি দেখেই আমার একবার মনে হয়েছিল যে এই শিশু কখনও সাধারণ নয়,—যেন নারায়ণ আমার সুমুখে। কিন্তু সোনার মোহরের মোহে আমার চৈতন্য ছিল না, কেমন করে সেগুলি একবার ভোগে লাগাতে পারবো সেই ভাবনায় ভিতরটা ছিল ওতঃপ্রোতঃ, ভরা। ভোগের আকাঙ্ক্ষায় উধাও ছুটেছি তখন। কোথাকার শিশু? কে তার খেয়াল রাখে! তখন কে ভাবতে পেরেছিল যে, যার লোভে আজ উধাও হয়ে ছুটেছি, জগদম্বার ইচ্ছায়, বিশ বৎসর ধরে তাই যক্ষের মত একটানে আগলে রাখতে হবে ঐ শিশুর হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবার জন্য। বলিয়া ভৈরব হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। এবারেও অবধূত কিছু বলিলেন না। ভৈরবের এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া অন্তরে সুখী হইলেন। এতকাল ধরিয়া গুরুগিরি করিয়া শ্রেষ্ঠত্বের গরিমায় ভৈরবের অন্তর কঠিন প্রেমশূন্য এবং স্নেহ মমতা দয়া প্রভৃতি কোমল বৃত্তি সকল প্রেরণার অভাবে এক রকম লুপ্ত হইয়াছিল। আজ তাঁহার সেই বৃথা অহঙ্কারের বাঁধ ভাঙিয়া গেল।

২৩

আজ অবধূতের প্রেমপূর্ণ স্নিগ্ধ মূর্ত্তি দেখিয়া প্রথমেই তাঁহার কঠিন অন্তর দ্রব হইয়াছিল, —আর সেই পবিত্র হাতের পরশ পাইয়া অন্তরের যত গ্লানি সব ধুইয়া নির্ম্মল হইয়া গেল। একটু সংযত হইয়া আবার তিনি বলিতে লাগিলেন,—অন্ধ আমি, গুরু সেজে, নিজেকে গুরুর আসনে বসিয়ে সরল বুদ্ধি শিষ্য সেবক ভক্তদের, অন্ধকারে অন্ধ যেমন পথ দেখায় সেই রকম এতকাল তাদের বিপথেই চালিয়ে এসেছি। নিজেকে গুরু মনে করলেই কেউ যে গুরু হতে পারে না, তিনি গুরুভাবে উদয় না হলে; তিনি অধিকার না দিলে, কেউ গুরু হতে পারে না,—এখন তা নিশ্চিৎ বুঝেছি! আমার,—এতদিন, —বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, অবধূতের পায়ের কাছে মাথাটি ঝুঁকিয়া পড়িল। অর্ক উঠিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে সস্নেহে তাঁহাকে বসাইয়া কহিলেন,—

আপনি আমার পিতৃতুল্য,—আমার প্রতি সেইরূপ স্নেহ রাখবেন। মানুষের জীবন-যাত্রায় এ সকল ভ্রম খুবই স্বাভাবিক—। বোধ হয় প্রত্যেক মানুষের এরকম হয়েই থাকে। সংস্কার আর সংসর্গ, গোড়া থেকেই এই দুটির প্রভাব আমি জানি,

সকলেরই উপর অসাধারণ ভাবেই থাকে, এতে আপনার দোষ কি? মা জগদম্বার কৃপা পেয়েছেন আপনি, তাতেই এই যোগাযোগ এসেছে—যার ফলে রোগমুক্তি আর সঙ্গে সঙ্গে নূতন কর্ম্মে, নূতন জন্ম লাভ হল আপনার। এখন সুস্থ হয়ে নিশ্চিন্ত ভাবে আপনার আসনে থাকুন, যথা সময়ে আমি আবার আসবো। এ সকল ধনও থাকুক আপনার কাছে,—ইতিমধ্যে লোকনাথকে পাঠিয়ে দেবো। আমার সঙ্গে তাঁর একাত্ম সম্বন্ধ, তার সঙ্গে আলাপ করে ধন্য হবেন। আমি আর তিনি অভেদ জানবেন এই ধন-রক্ষা বা গ্রহণের ব্যাপারে। তিনি মহা ত্যাগী এবং নিঃস্বার্থ ভগবদ্ভক্ত, জগদম্বার কৃপা প্রাপ্ত মহৎকর্ম্মের অধিকারী। আপনি নিরুদ্বিগ্ন, নিশ্চিন্ত হয়ে থাকুন। তারপর বলিলেন,—এবার আমায় যেতে হবে,—বিশেষ প্রয়োজনে—এখন আমায় বিদায় দিন। আবার আমি আসবো আপনার আশ্রমে।

রাত্রি তখন প্রায় দ্বিপ্রহর। নৌকা প্রস্তুত ছিল,—সকলের সঙ্গে প্রীতি-সম্ভাষণ করিয়া,—এবং সকলকে মুগ্ধ করিয়া তিনি সেই রাত্রেই যাত্রা করিলেন। ভৈরব সেরাত্রে কোন মতে তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে না পারিয়া,—তাঁহাকে নৌকায় পৌঁছাইয়া দিয়া গেলেন, কারও নিষেধ তিনি মানিলেন না। ভৈরবের যেন আর কোন রোগই নাই।

অবধূতের অদর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রাণের মধ্যে হু হু করিয়া উঠিল, যেন তাঁহার অতি প্রিয় বস্তু হারাইয়াছেন। ধীরে ধীরে, এই প্রেরণা তাঁহার নিজের মধ্যেই আবিষ্কার করিলেন, সত্যই যেন তাঁহার নবজন্ম হইয়াছে, এই অল্প সময়টুকুর মধ্যে। আর উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীও কম আশ্চর্য্য হয় নাই ভৈরবের ব্যাপার দেখিয়া। যে মানুষ আজ এতদিন ভুগিতেছেন, বিশেষতঃ যিনি একপক্ষ হইতে শয্যাগত, উঠিয়া বসিবার শক্তি ছিল কি-না সন্দেহ, আজ এই অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই মানুষ স্বচ্ছন্দে ঘর-বাহির করিতেছেন, এমন কি এত রাত্রে তিনি নদীতীর পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসিলেন। বিস্ময়ের উপর বিস্ময়,—ভৈরব সকলকে ডাকিয়া স্নেহপূর্ণ গদগদ স্বরে কহিতে লাগিলেন,—

ভাই সকল,—জেনে রাখো এখন থেকে আমি আর তোমাদের গুরু নই। যে মহাপুরুষ আজ এসেছিলেন, ভগবানের ইচ্ছায় তিনি নিজ শক্তিতেই সকলকার গুরুস্থান অধিকার করেছেন। তাঁর শক্তি তোমরা প্রত্যক্ষ করতে পার এই আমাকে দেখে। তিনি আমার শুধু রোগমুক্ত নয়, সমস্ত পাপ থেকে আমার মনকে, এই কঠিন, ভোগলোলুপ নীচ ও স্বার্থপর—মনকে,—আর বলিতে পারিলেন, না ভাবাবেশে কণ্ঠরোধ হইল। সেই রাত্রিটুকু

তাহাদের অবধূতের কথা আলোচনাতেই কাটিল,—কাহারও আজ নিদ্রার কথা মনেই ছিল না।

২৩

এদিকে অবধূত যথাকালে স্বস্থানে ফিরিয়া পার্ব্বতীর উদ্বেগ বিক্ষুব্ধ চিত্ত শান্ত করিবার পূর্ব্বেই দেখিলেন, লোকনাথ আসিয়া তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে।

—এটিও দৈব ব্যাপার, লোকনাথ! তোমার ইষ্টসিদ্ধির সময় এসেছে,—বলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তার পর বসিয়া দুইজনের মধ্যে সমাচার আদান-প্রদান চলিল। পরে ভৈরব করালীর-প্রসঙ্গ, তাঁহার ইতিহাস বলিতে আরম্ভ করিয়া নিজ অতীত হইতে জন্ম ও বাল্য-জীবনের কাহিনী, সেই কাপালিকের কথা, সবই আসিয়া পড়িল। তাহা সম্পূর্ণ হইলে অর্ক কহিলেন,—এখন বুঝে দেখ লোকনাথ, মানুষে কাজ করে আর কাজের সিদ্ধির এতটা বড়াই করে কিন্তু তার উপাদান যোগায় কে?—

লোকনাথের কানে কিন্তু তাঁহার শেষ কথাগুলি গেল কিনা বুঝা গেল না,—তাহার মনে যে সকল কথা একটার পর একটা উঠিতে আর মিলাইতেছিল, তাহার মধ্যে বিশে একটি এই যে,—কে ইনি, এই ভাবে নিজ জন্ম-কাহিনী এত সহজ সরল, এবং বহু একজনের কাছে নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারেন? এই মানুষটি, এমন করুণামাখা শান্তমূর্ত্তি ধরিয়া, এত সহজ ভাবে সকলকেই আপন করিয়া আমাদের মধ্যে আসিয়াছেন। ইঁহার প্রত্যেক কথা, হাবভাব, চলন, উপবেশন, সকল কর্ম্মই অলৌকিক; এ জগতের নয়,—ভাগবতী শক্তি যেন মূর্ত্তিমান হইয়া আসিয়াছেন আমাদের পথ দেখাইতে, আর সকলকার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে।

লোকনাথের মুগ্ধভাব দেখিয়া অবধূত,—এসো এবার আসল কথা কওয়া যাক্। বলিয়া,—দৈবপ্রাপ্ত ধনের কথা—উঠাইলেন। আর অর্থ সংগ্রহের জন্য শক্তি ব্যয় করিতে হইবে না, এখন হইতে ধন আপনি আসিতে থাকিবে। যে ধন-সমষ্টি পাওয়া গিয়াছে, ইহাদ্বারা লোক-কল্যাণের কর্ম্ম বহু বিস্তৃত হইতে পারিবে। কেমন করিয়া বিস্তার হইবে, তারপর বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র গড়িতে কত অবসাদ, কত অপমান, সত্য মিথ্যা এত নিন্দাস্তুতি হজম করিতে হয়। এ সব তো বাইরের কথা, ভিতরের ব্যাপার আরও জটিল, আরও কূট, সে সকল আগে লক্ষ্য না থাকিলে সেই সময় বিপর্য্যয় ঘটাইতে পারে। ক্রিয়াশক্তির সঙ্গে প্রতিক্রিয়া কিরূপ অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, যতই বিশাল, যতই

কল্যাণকর হোক না কেন সেই কর্ম্ম। প্রকৃতির রাজ্যে উদ্দেশ্যমূলক কোন কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানই নিরবচ্ছিন্ন শুভ নয়। কি ভাবে কেন্দ্রের ক্রিয়াশক্তি হইতেই প্রাকৃতিক নিয়মেই কর্ম্মসঙ্কট উৎপন্ন হয়, পরিণামে তা ধ্বংসের কারণ হয় যেহেতু সৃষ্টির মধ্যেই ধ্বংসের বীজ থাকে। শেষে বলিলেন, কেমন করিয়া অহংকে সঙ্কোচ করিয়া অথবা সেই অহংকে বিরাট ভাবে বিশ্বচৈতন্যের সঙ্গে যুক্ত করিয়া প্রতিক্রিয়া ফল এড়াইতে হয়। এই সকল ব্যবহারিক তত্ত্ব উপদেশ দিয়া শেষে বলিলেন,—যাহারা কর্ম্মচক্রে পড়িয়া অহংকে সেই কর্ম্মের উদ্দেশ্যের সঙ্গে জড়াইয়া ফেলে তাহারা ইহার প্রভাব এড়াইবে কেমন করিয়া ?

এইভাবে যেন প্রকৃতির হইয়া তিনিই যোগাযোগটা ঘটাইয়া দিলেন। সেইদিন তাহাকে একটি বিরাট প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত কেন্দ্রের মানুষ গড়িয়া ছাড়িলেন। কর্ম্ম অবশ্য আগেই আরম্ভ হইয়াছিল, এখন তাহার বিস্তারের যোগাযোগটা ঘটিল আর লোকনাথ উহা পূর্ণ উদ্যমে চালাইবার শক্তি লাভ করিল।

সুযোগ বুঝিয়া অর্কাবধুত পরদিন প্রভাতে পার্ব্বতীকে লইয়া গঙ্গাতীরে সেই কাপালিকের আশ্রম ও প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংস স্তূপের নিকটে বসিলেন। তারপর আরম্ভ করিলেন, তাঁর জন্ম ও জীবন-কথা। শিশুকালে জ্ঞানের উন্মেষ হইতে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সকল কথা, আজ পর্য্যন্ত যাহা পার্ব্বতী কখনও শুনেন নাই। শেষে গত রাত্রে করালী ভৈরব-সংক্রান্ত সকল ব্যাপার বর্ণনা করিলেন। আনুপূর্ব্বিক সকল কিছু শুনাইয়া পার্ব্বতীর পানে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার শরীর স্থির, নিশ্চল, যেন নির্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থা।

অনেকক্ষণ পর পার্ব্বতীর নিঃশ্বাস পড়িল। অর্ক সহজ ভাবেই কহিলেন,—দেখ পার্ব্বতী, আমার জীবন-কাহিনী তোমার যতই আশ্চর্য্য লাগুক, এখনও,—আমার এমন মনে হয় অনেক কিছুই ঘটতে বাকী আছে আমার ভবিষ্যৎ জীবনে, যা আগের চেয়েও বিস্ময়কর,—আর এখন আমি যেন তার আভাস পাচ্ছি।

—যে পথে আমায় চালিয়েছ তুমি,—তাতে আমি আর অন্য দিকে কিছুই ভাবতে পারি না, কেবলই দেখছি আমাদের উপলক্ষ করে বিধাতার কর্ম্ম-কৌশল। প্রত্যেক মানুষের কথা বলতে পারি না, তবে এক একটি বিশেষ-বিশেষ মানুষের জীবন নিয়ে তিনি যেন ঠিক খেলা কচ্ছেন, নয় কি ?

—আহা পার্ব্বতী; অপূর্ব্ব তত্ত্ব তাঁর এই খেলা। এক একটি নয়, প্রত্যেকের

জীবন হল তাঁর খেলার ঘুঁটি—যোগাযোগ ঘটিয়ে যিনি এত বড় বিশাল সৃষ্টি চালাচ্ছেন, প্রকৃতিরূপা সেই নিয়তিকে তুমি চেন না। তাঁর বিধান অতিক্রম কে করবে?

—আচ্ছা, ভৈরবের লক্ষ্মীকৌটায় যে রত্নময় যন্ত্রের কথা বললে—আমায় একবার দেখাবে?

—নিশ্চয়ই দেখাবো। তবে তোমার পক্ষে সে হবে একটি বড় কঠিন পরীক্ষা। একে নারী,—তার উপর সেই অমূল্য রত্ন একটি পরম বিস্ময়—যা দেখতে পাওয়াও মহা সুকৃতির ফল। অপ্রতিহত আকর্ষণ তার, অতীব বিস্ময়কর প্রভাব, একটি বড় রাজ্যের বিনিময়েও তা পাওয়া যায় না। তারপর আমার অধিকারে সেটি এসেছে দেখে হয়তো তোমার লোভ হবে সেটি অধিকার করতে। কিন্তু তাতে মহাবিপদও আছে,—সেটি মহাশক্তিশালী দৈবযন্ত্র।

শুনিয়া পার্ব্বতী বলিলেন,—পরীক্ষার যখন কিছু দেরী আছে, তখন সে-কথা থাক। আচ্ছা ও জিনিষ নিয়ে তুমি কি করবে? আর সেটি অধিকারে মহা বিপদই বা কি রকম?

অর্ক বলিলেন—আমার মনে হয় তিব্বতের কোন উচ্চ স্তরের সাধক বা তারা-উপাসকের মহাশক্তিমান সম্পদ এইটি, যাকে বলে প্রাণের ইষ্ট বস্তু, অমূল্য ধন এই দৈবযন্ত্রটি। আমার মনে হয়, কেউ চুরি করে এটি সেখান থেকে এখানে এনেছিল, তারপর কোন রকমে ঐ ভৈরবের হাতে এসেছিল, তাঁকে নিপাত করতে। আমার সন্দেহ হয় যে ভৈরব এর ব্যবহার জানতেন না। শুধু লোভে পড়েই আকৃষ্ট হয়ে এটি আগলে আটটি দিন মাত্র রাখতে পেরেছিলেন শুনেছি। কে জানে হয়তো এই জীবন্ত, সিদ্ধিদাতা কবচের প্রভাবেই সিদ্ধির দিনেই ভৈরবকে ঐ ভাবে মরতে হয়েছিল। আর করালী ভৈরবও তো মরতে বসেছিলেন এতকাল পরে। সেও ঐ দৈবযন্ত্রের প্রভাব, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।

২৬

ভয় পাইয়া পার্ব্বতীর পূর্ব্ব আকর্ষণ আর রহিল না,—কহিলেন,—সর্ব্বনাশ! ও জিনিষ কাছে রাখাও ত বিপদ, কে জানে কখন কি ভয়ানক পরিণাম আনবে। তুমি ওটা নিও না হাতে,—কাজ নেই তোমার ব্যবস্থায়,—ওটা গঙ্গার মধ্যে ফেলে দাও, তোমার কি ভয় হয় না?—

এতটা শক্তিশালী রত্নময়-যন্ত্র এর আগে আমি দেখিনি। আরও একটা আশ্চর্য্য কথা শুনবে? যেই মাত্র ভৈরব এই যন্ত্রটি আমার হাতে দিলেন, ঐ বস্তুটির অধিকার ত্যাগের সঙ্কল্পের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি রোগমুক্ত হয়ে গেলেন, প্রত্যক্ষ করলুম। তিনি তারপরে এমনই স্বচ্ছন্দে বেড়াতে লাগলেন যেন কোন অসুখ আর নেই। তাই দেখে ওটা আর তাঁর কাছে রাখতে সাহস করলাম না,—নিজের কাছেই রেখে দিয়েছি।

পার্ব্বতী বলিলেন—অদ্ভুত! এমন তো কখনও দেখিনি। যাই হোক তুমি কি করবে ও নিয়ে?

অর্ক মৃদু হাসিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন;—ওটার ব্যবস্থা আমাকেই করতে হবে,—তাই না ওটি নিজে আমার কাছে এসেছে! যতক্ষণ না ওর উপযুক্ত ব্যবস্থা হবে,—আমার আর নিষ্কৃতি নেই। ওটা যে জীবন্ত রত্ন, পার্ব্বতী। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, ওটি নিয়ে, আমাকে কি করতে হবে তার চূড়ান্ত মীমাংসা নিয়েই ওটি আমার কাছে এসেছে।

—আমার বড় ভয় আছে, বল কি ব্যবস্থা করবে? না শুনে নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।

—এখন সেকথা থাক না, পরে—, বাধা দিয়া পার্ব্বতী বলিলেন,—নিশ্চয় তুমি আমার কাছে তোমার উদ্দেশ্য গোপন করচো, হয়তো আমি বাধা দেবো এই মনে করে। কিন্তু তাতে আমার ভয় আর উদ্বেগ যে কত বেশী ভোগ করতে হচ্ছে তা তুমি লক্ষ্য করচ না। বল সত্য কিনা?

—সম্ভব; বলিয়া অর্ক গম্ভীর মুখে বরাবর সেই ধ্বংসস্তূপের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পার্ব্বতী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং অবধূতের উপর ইহার প্রভাব কিরূপ হইবে ভাবিয়া উৎকণ্ঠায় অস্থির হইলেন। অথচ অবধূত বলিতে চান না—কাজেই ব্যাপারটি কি শুনিবার জন্য আগেই তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন যে যন্ত্রের ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁহার যে কোন উদ্দেশ্যই থাক না কেন, তিনি কোনরূপ বাদপ্রতিবাদ করিবেন না, বা বাধা-সৃষ্টি করিবেন না।

এই কথা শুনিবামাত্র তাঁহার মুখ প্রসন্ন হইল; তিনি বলিলেন,—জগদম্বার প্রত্যক্ষ আশীর্ব্বাদ আমার উপর এসেছে পার্ব্বতী,—ঐ যন্ত্রের ব্যাপারে। শোন দেবী,—আগামী বৈশাখ মাসের দ্বিতীয় দিনে নেপালের পথে আমি তিব্বত যাবো ঐ যন্ত্রটিকে অধিকারীর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে। তিব্বতের মতো এতোবড় একটি যোগধর্ম্মের ক্ষেত্র আর

তন্ত্রধর্ম্মের তীর্থ এ জীবনে দেখবার যে যোগাযোগ,—তাকেই আমি তাঁর আশীর্ব্বাদ বলছি। জগদম্বার অদ্ভুত কর্ম্ম-কৌশলের কথা বলছিলে, তা হলে শোনো তাঁর কৌশলের কথা। অনেক দিন থেকেই তিব্বতে যাবার প্রবল ইচ্ছা ছিল, তন্ত্রধর্ম্মের আসল ক্ষেত্রটি দেখতে। এবারে সেই জন্য নেপালেও গিয়েছিলাম। সেখানে বন্ধুও জুটেছে, রাজ-পরিবারের দুইজন আমায় স্নেহের চক্ষে দেখেছেন। আর আপন ভেবে আমায় ভবিষ্যতে যখন ইচ্ছা তিব্বতে যাবার সুবিধা করে দেবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। দেখ পার্ব্বতী! কি অপূর্ব্ব যোগাযোগ! ঐ যন্ত্রটির উপযুক্ত ব্যবস্থার ভার—যখনই এসেছে আমার উপর, সেই মুহূর্ত্তেই আমি তাঁর এই নির্দ্দেশ পেয়েছি যে তার অধিকারীর হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার মহৎ উদ্দেশ্যেই আমায় তিব্বৎ যেতে হবে। আর তার অবান্তর ফল হবে, কত কিছু দেখা, শোনা, আর শেখা। বল পার্ব্বতী, যিনি এই যোগাযোগ ঘটিয়েছেন, এত বড় অধিকার দিয়েছেন আমায়, তাঁর কতো প্রীতি,—

২৪

তাঁহার তিব্বৎ যাইবার উদ্দেশ্য বুঝিয়া মনের মধ্যে কিছু ক্ষুণ্ণ হইলেও পার্ব্বতী যন্ত্রের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হইলেন। বলিলেন,—তোমার এই শুভকাজে কে বাধা দেবে? কিন্তু এখানে যে একটা প্রকাণ্ড কাজের আয়োজন,—তার ভার,—বাধা দিয়া অর্ক বলিলেন,—সেতো লোকনাথের কাজ, তাতে তারই অধিকার, জগদম্বা তাকেই পূর্ণ ভাবে শক্তিমান করে প্রস্তুত করেছেন ঐ কাজের জন্য,—সে সব ঠিক চলবে, ধৈর্য্য ধরে আর একটি বছর অপেক্ষা করো পার্ব্বতী! দেখবে কি বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র গড়ে উঠেছে লোকনাথের কর্ম্মকৌশলে আর তুমি হবে তার কেন্দ্রের মহাশক্তি,—জগদম্বার প্রতীক। শুনিয়া পার্ব্বতী বলিলেন, দেখ, তোমাদের বিরাট কর্ম্মক্ষেত্রের কেন্দ্রের শক্তিটি যে কে তা আমি জানি আর কার কর্ম্মকুশলতায় এ সব হচ্চে তাও আমি জানি, ও সব মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলে আমায় ভোলাতে পারবে না। আমার জায়গায় এই ভাঙা ইট্‌খানা রেখেও ঐ বিরাট কর্ম্ম ক্ষেত্র গড়তে পারতো, জগদম্বার প্রতীক বলে তাও জানি। সে যাক্, আমি এখন না হয় জগদম্বার প্রতীক হলাম,—আর তুমি?

—আমি তো সমাজের অস্পৃশ্য, সেই রকমই থাকবো। যেমন সেকালে ছিল ব্যবস্থা। সে জানো কি রকম? যত অস্পৃশ্য, দিনমানে নগরের মধ্যে এসে কাজ-কর্ম্ম করার অধিকার ছিল কিন্তু সূর্য্যাস্তের পর রাত্রে তাদের সকলকেই থাকতে হতো নগর-প্রাচীরের বাইরে,—

আমিও সেই রকম তোমাদের কর্ম্ম-কেন্দ্রের বাইরেই থাকবো। প্রয়োজনে মাঝে মাঝে আসবো।

—এতদিন পরে এলে, বোধ হয় পনেরো দিনও হয়নি। তাই ভাবছি—এত শীঘ্র আবার চলে যাবে? আমি কিন্তু এর জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না।

—হায় পার্ব্বতী,—এখনও বুঝলে না—জগদম্বার কাজ বলতে কি বুঝায় আর কি রকম জীব তাঁর কর্ম্মের অধিকারী হয়। আত্মসুখসর্ব্বস্ব যারা তারা কি তাঁর কর্ম্মের উপযুক্ত হতে কখনও পারে?—যারা তাঁর কাজ করে, তারা জানে তাঁর কাজে প্রস্তুত হবার সময় পাওয়া যায় না, কখন কি ভাবে কোন কাজ ঘাড়ে চাপিয়ে দেন—সে কাজ শেষ না হলে আর অব্যাহতি নেই। সে রহস্য কেবল তিনিই জানেন, আর তাঁর হাতের যন্ত্র যারা তারা আভাসে কতকটা জানে। তাঁর কাজ সব এমনই অদ্ভুত! আচ্ছা, আজ এই পর্য্যন্ত। পার্ব্বতী, তোমাদের কল্যাণ হোক। বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

আর একবার অবধূত ভৈরব করালীর কাছে গেলেন—আগে প্রতিশ্রুত ছিলেন। ভৈরব তাঁহাকে পাইয়া আনন্দে উন্মত্ত হইলেন। যাহা কিছু বলিবার, যাহা কিছু করিবার সে সকল করিয়া শেষে, নিজ অভিপ্রায় মত ঐ যন্ত্রটি অধিকারীর হাতে ফিরাইয়া দিবার জন্য তিনি নেপাল হইয়া তিব্বৎ যাইতেছেন সে কথা প্রকাশ করিলেন। লোকনাথ ইতিমধ্যে আসিয়া তাঁহার কাছে সকল উদ্দেশ্যের কথা বলিয়া গিয়াছে। ভৈরব এখন সম্পূর্ণই সুস্থ হইয়াছেন। অবধূতের কাছে উপদেশ চাহিলেন কিভাবে দিন কাটাইবেন। ভৈরবের যথাসাধ্য সকল ব্যবস্থা করিয়া তারপর লোকনাথের সঙ্গে সকল কর্ম্ম শেষ করিয়া যাত্রার দিন সকলের নিকট বিদায় লইয়া অর্কাবধূত পার্ব্বতীর আশ্রম-মন্দিরে আসিয়া দেখা দিলেন; হাতে একটি পুলিন্দা। দেখিয়া পার্ব্বতী বলিলেন,—তুমি যে শেষে আশীর্ব্বাদ দিতে আশ্রমে একবার আসবে, তা আমি জানতাম। এখন ওটা কি তোমার হাতে।

—দেখ পার্ব্বতী, এই পুলিন্দাতে যে বস্তু আছে তাই পেয়ে তিব্বতের সাধক-সমাজ কৃতার্থ হবেন আর সেই উপলক্ষ করে ভারতবর্ষের যদি গৌরবের কিছু থাকে, তাও এর জন্যেই প্রতিষ্ঠিত হবে। যেখানে যাচ্ছি সেখানে দর্শন-শাস্ত্রের, যোগ-শাস্ত্রের, তন্ত্র-শাস্ত্রের, পুরাণ ইতিহাসের নানা শাস্ত্রের মহা মহা গ্রন্থ সকলের অভাব নেই। ভারতে যা নেই তা হয়ত সেখানে আছে। কিন্তু এই যে পুঁথিখানি দেখচো আমার হাতে,—এই দুর্ল্লভ বস্তু সেখানে নেই, এই গ্রন্থের তত্ত্ব তাঁদের অজ্ঞাত। সেদিন তোমায় যোগশাস্ত্রের আশ্চর্য্য

আবিষ্কার যা আমার গুরুদেবের কাছ থেকে পেয়েছি সে কথা বলেছিলাম। আমি ঐ পুঁথি দু'খানি নকল করেছি, একখানি নেপালের রাজগ্রন্থশালায় দিয়ে, অপর খানি তিব্বতে নিয়ে যাব। মনে কর, ভারতবর্ষ থেকে যাচ্ছি, এ খানি হবে ভারতের দান। দেওয়া আর নেওয়া নিয়েই তো জগৎ-সমাজের সঙ্গে প্রেমের সম্বন্ধ রাখতে হয়! এখন আমায় বিদায় দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত মনে নিজ কর্ম্মের মধ্যে আনন্দে ডুবে যাও।

২৭

তিব্বত দেশটি প্রকাণ্ড, কিন্তু যত বড় দেশ লোক-সংখ্যা তার তুলনায় ঢের কম। তাহার মধ্যে যতগুলি প্রদেশ আছে সবগুলিই বেশ সুরক্ষিত আর কেন্দ্রে এক একটি প্রকাণ্ড সহর। আবার কোন কোন প্রদেশে একাধিক বড় নগর আছে। আর প্রত্যেক নগরে এক একটি প্রকাণ্ড মঠ, আবার তার অধীনে ছোট ছোট অনেক মঠ।

এখন আমাদের কথা চিগাচ্চি বলে এক প্রকাণ্ড প্রাচীন নগরস্থ প্রধান মঠের কথা,—যাহা তিব্বতের মধ্য প্রদেশে অবস্থিত। ঐ নগরটি ম্যাপে ইংরাজিতে সিগাটসি নামেই নির্দ্দিষ্ট আছে। এখন ঐ সহরের প্রধান মঠের যিনি প্রধান লামা হইয়াছেন, তাঁর যৌবনকালে অর্থাৎ যখন তাঁর পঁচিশ, ছাব্বিশ বৎসর বয়স,—তিনি একবার মঙ্গোলীয়ায় প্রাচীন তীর্থগুলি ভ্রমণে গিয়াছিলেন। সে-যাত্রায় তিনি চীন ও মঙ্গোলীয়ার মধ্যে যত প্রাচীন তীর্থ, প্রধান প্রধান বৌদ্ধ মঠ ভ্রমণ করিয়া—এবং প্রত্যেক তীর্থে কিছুদিন বাস, আর উপযুক্ত ক্ষেত্রে তপস্যা, সাধনাদি সম্পন্ন করিয়া শেষে মঙ্গোলীয়ার অন্তর্গত উর্গা নগরের প্রধান মঠে অতিথি হইলেন।

উর্গা নগর প্রাচীন এবং বিখ্যাত বিদ্যা ও ধর্ম্ম-সাধনের ক্ষেত্র। সেখানকার প্রধান মঠের যিনি মোহান্ত, তিনি সিদ্ধযোগী আর উচ্চ শ্রেণীর পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর যোগৈশ্বর্য্যের কথা ও অঞ্চলে প্রসিদ্ধ। ক্রমে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে তিব্বতবাসী বৈরাগ্যবান্ নবীন যুবা চিগাচ্চি লামার প্রবল সাধন-তৃষ্ণা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে উচ্চ সাধনের পন্থা কয়টি দেখাইয়া দিলেন।

তিনি অধিকতর প্রসন্ন হইয়া দেখিলেন যে তাঁহার উপদেশ মত ক্রিয়াগুলি অল্প-সময়ের মধ্যেই তিনি আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। এবার, ভবিষ্যতে তাঁহার সিদ্ধির আভাস পাইয়া সিদ্ধ যোগী তাঁহাকে তারামন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। মন্ত্রপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই

লামার মধ্যে অসাধারণ কতকগুলি লক্ষণের প্রকাশ দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং তাঁহার মণিময় সিদ্ধ-যন্ত্রটি তাঁহাকে দান করেন।

দাতা, ঐ দৈবযন্ত্রের সিদ্ধির প্রক্রিয়াগুলি দেখাইবার পূর্ব্বে এই প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন যে, সিদ্ধির পূর্ব্বে এ যন্ত্র কাহাকেও দেখাইবেন না। আর তাঁহার সিদ্ধির পর উপযুক্ত তারা উপাসককেই আবার উহা দান করিবেন। উপযুক্ত সাধক পাইলে সিদ্ধির পর, ইহা কথনও আর কাছে রাখিবেন না। ইহাই এই সিদ্ধ-যন্ত্রের নিয়ম। তিনি বলিয়াছিলেন যে, যন্ত্রের মধ্যমণি স্বরূপ ঐ মাণিকখানি অমূল্য, রাজ্য বিনিময়েও পাওয়া যায় না, যেন কদাচ ইহা যন্ত্রচ্যুত না হয় ; হইলে যন্ত্রের শক্তি ও মাহাত্ম্য নষ্ট হইবে। আরও বলিয়াছিলেন যে তপঃশক্তিহীন অনধিকারীর হাতে উহা থাকিবে না, কেহ বলপূর্ব্বক অধিকার করিলে তাঁহার সর্ব্বনাশ, এমন কি প্রাণান্ত হইতে পারে।

এই ভাবে তিনটি বৎসর সাধনের পর যখন তিনি দেশে ফিরিবার অনুমতি পাইলেন তখন যাত্রার পূর্ব্বে গুরু তাঁহাকে বলিলেন, যদি কখনও ইহা দৈবদুর্ব্বিপাকে হস্তান্তরিত হয়, উহা আবার তাঁহার হাতেই আসিবে ও তাঁহাকে সিদ্ধি দিবে। সিদ্ধিশক্তি ইহার মধ্যে বর্ত্তমান। বিদায়কালে কতকগুলি মূল্যবান প্রাচীন গ্রন্থও তাঁহার প্রীতির নিদর্শন-স্বরূপ উপহার দিয়া এক শুভক্ষণে যাত্রার যথাসাধ্য ব্যবস্থা করিয়া শিষ্যকে বিদায় দিলেন। এইভাবে পাঁচ বৎসর পর তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

মহাশক্তিমান হইয়া তিনি চিগাচ্চিতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার অপূর্ব্ব তীর্থপর্যটন এবং সাধন বৃত্তান্ত এই অঞ্চলের মধ্যে প্রথমে তারপরে দূর অঞ্চলের ধর্ম্মসমাজে রাষ্ট্র হইয়া গেল। এই ভাবে কয়েক মাস পর, যখন তিনি প্রধান চিগাচ্চি মঠে ঐকান্তিক সাধনায় ব্যাপৃত, তখন লাসায় দলাই লামার নিকট হইতে তাঁহার আহ্বান আসিল। তিনি উর্গা হইতে যে সকল প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ সকল আনিয়াছিলেন, তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে সে কথাও প্রচার হইয়াছিল। দলাই লামা এরূপ একজন বহুদর্শী সাধকের সঙ্গলাভের জন্যই ব্যাকুল হইয়াছিলেন। দলাই লামার আহ্বান উপেক্ষার নয়, কাজেই তাঁহাকে যাইতে হইল।

লাসা ওখান হইতে দেড় মাসের পথ। দলাই লামার প্রেরিত দূত-সহ পাঁচজন অনুচর সঙ্গে এক গাধার পিঠে তাঁহার গ্রন্থাদি ও নিজ ব্যবহার্য্য দ্রব্যের ভার চাপাইয়া

অশ্বারোহণে তিনি যাত্রা করিলেন। মণিময় সিদ্ধযন্ত্রটি গোপনে আপন বুকের বস্ত্র-মধ্যে লইলেন।

লাসায় পৌঁছাইবার প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব্বে তাঁহারা চির লাং নামে এক দুর্গ মধ্যস্থ মঠে অতিথি হইলেন। সেইদিন একদল দস্যুও ঐ দুর্গের নীচে মাঠে একটু তফাতে তাঁবু ফেলিয়াছিল। তাহারা নিজেদের পশুলোম-ব্যবসায়ী পরিচয় দিয়া নানা দিকে দস্যুবৃত্তি করিত।

ঐ চিগাচ্চি লামার সঙ্গে অনুচরবর্গ যাহারা ছিল তাহারা ঐ তাঁবুতে সেই রাত্রে উপস্থিত হইল একটু মদ্যপান, একটু স্ফূর্ত্তির আশায়, কারণ মঠাভ্যন্তরে তাহাদের ওভাবের আমোদ প্রমোদ বা আনন্দ লাভের আশা ছিল না। ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মদ্যপান নিষিদ্ধ ছিল। দস্যুদলের সঙ্গে তারা বেশ মিলিয়া গেল। পানানন্দের অবকাশে দস্যুদলপতি যাহা কিছু জানিবার জানিয়া লইল। বিশেষ কথা এই যে সঙ্গে কিছু ধনসম্পদ আছে কিনা। লামারা কোথা হইতে আসিলেন, কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন এবং কোথা যাইবেন— তাহারা সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের পশ্চাদ্গমনের পরামর্শ ও আয়োজন ঠিক করিয়া রাখিল।

পরদিন প্রভাতে সদলবলে লামা যাত্রা করিলেন, এবং কিছুক্ষণ পর দস্যুদলও তাঁবু গুটাইল। সেই দিন অনুসরণ করিয়া সুযোগ বুঝিয়া দ্বিতীয় দিনে তাহারা এক বিস্তৃত প্রান্তর মাঝে তাঁহাদের আক্রমণ করিল। দলে তাহারা বারোজন। লামার যে পাঁচজন সঙ্গী ছিল, ডাকাত দলের আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা আত্মসমর্পণ করিল। কেহই প্রতিরোধ বা প্রতিবাদ করিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করিল না। সুতরাং বিনা বাধায় লামার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইল। তাঁহার নিকট যে বিশ পঁচিশটি স্বর্ণ মুদ্রা ছিল এবং ঐ পাঁচজনের কাছেও যাহা কিছু ছিল সে-সকল সংগ্রহ করিয়া দস্যুরা প্রত্যেককে উলঙ্গ করিয়া বাঁধিল। তাঁহাদের পোষাক-পরিচ্ছদ, ঘোড়া এবং মালবাহী গাধাটি পর্য্যন্ত,—এক কথায় যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া চলিয়া গেল। কেবল পুঁথিগুলি সেখানে ফেলিয়া গেল, লইল না। তীব্বতের দেশীয় দস্যুদল হইলে কখনই লামাকে আক্রমণ করিত না; ইহারা সিকিমের বিধর্ম্মী মুসলমান বলিয়াই লামাকে এভাবে পীড়িত করিয়াছিল ইহা শেষে বুঝা গেল। দুই দিন পর তাঁহাদের উদ্ধার হইল, অর্দ্ধমৃত অবস্থায় তাঁহারা কেবল গ্রন্থগুলি সঙ্গে লইয়া লাসায় পৌঁছিলেন। সকল বৃত্তান্ত অবগত

হইয়া দলাই লামা রাজশক্তি প্রয়োগ করিয়া নানাভাবে দস্যুদল ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন ফল হয় নাই। এই ভাবে লামার মণিময় সিদ্ধযন্ত্রটি বিধর্ম্মী দস্যু-হস্তে গেল।

প্রায় আঠারো বৎসর পরের কথা,—অর্কাবধুত নেপালের মধ্যে প্রায় দুই মাস কাল ভ্রমণ করিয়া আষাঢ়ের প্রথমেই লাসায় পৌঁছিলেন। নেপাল সরকারের ব্যবস্থামত এক নেপালী সওদাগর, লাসায় যাহার কারবার আছে, তাহারই সঙ্গে নেপাল সরকারের পরিচয়-পত্র লইয়া তিনি লাসায় উপস্থিত হইয়া পোটোলার নিকটস্থ এক মঠে অতিথি হইলেন।

মঠের মোহান্ত তাঁহাকে ভারতীয় যোগী বলিয়া প্রথম হইতেই অসাধারণ শিষ্ট এবং ভব্য ব্যবহার করিতেছিলেন। একটি বৎসর অবধুত সকল উদ্দেশ্য গোপন করিয়া তিব্বতী ভাষা শিক্ষায় মনোযোগী হইলেন এবং সেই মঠের প্রধান লামা হইতে আরম্ভ করিয়া অন্য লামা সকলকেই সৌহার্দ্যসূত্রে বাঁধিয়া ফেলিলেন। এই অল্প সময়ে তাঁহার তিব্বতী ভাষায় দক্ষতা দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইলেন।

মঠের প্রধান লামা সংস্কৃত সাহিত্যে শ্রদ্ধান্বিত এবং তাঁহার সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্রে গভীর জ্ঞান এবং প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইলেন। তিব্বতে সন্ন্যাসী অপেক্ষা যোগীগণের প্রভাব অধিক। সেখানে ত্যাগী ও যোগী এই দুই শ্রেণীই সাধারণতঃ দেখা যায়। ত্যাগী সন্ন্যাসী সংখ্যায় বেশী। আর তাঁহারাই মঠাশ্রয় করিয়া সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ধর্ম্ম ও বিদ্যাশিক্ষাদানের জন্য প্রচুর ধন সম্পত্তির অধিকারী;—যোগীরা প্রায়ই কোন মঠাশ্রয় করেন না। কিন্তু করিলেও বাধা নাই। যাহা হউক যোগশাস্ত্রে অবধুতের অসাধারণ অধিকার লক্ষ্য করিয়া বিশেষতঃ নবতর যৌগিক পন্থা, যাহা তিনি এখানকার প্রধান লামাকে দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সিদ্ধির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে গুরুর আসন দিলেন। ক্রমে তাঁহার আনীত ঐ নবযোগ-তত্ত্ব যোগী-সম্প্রদায়ের লামাগণের গভীর আলোচনার বস্তু হইয়া উঠিল। এই ভাবে তাঁহার যোগ ও বিভূতির বার্ত্তা দলাই লামার কানে গেল এবং অচিরাৎ পোটালা হইতে অনুচর বার্ত্তাবহ আসিয়া মঠের মোহান্ত লামার কাছে দলাই লামার লিখিত এই আদেশ জ্ঞাপন করিলে যে, ভারতীয় যোগীকে লইয়া তাঁহাকে পোটালায় যাইতে হইবে। অবধুত ইহাই চাহিতেছিলেন।

প্রথমেই তাঁহার অপরূপ সৌম্য মূর্ত্তি দেখিয়া দলাই লামা আকৃষ্ট হইলেন, তারপর তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া বিস্মিত হইলেন তাঁহার তিব্বতী ভাষায় অসাধারণ অধিকার দেখিয়া। তারপর মুগ্ধ হইলেন তাঁহার ধর্ম্ম-সাধনা এবং সর্ব্বশাস্ত্রে জ্ঞান—বিশেষতঃ যোগ দর্শন-শাস্ত্রে গভীরতম ব্যুৎপত্তি অনুভব করিয়া। এক সভা আহ্বান করিয়া অবধূতের পরিচয় জ্ঞাপন এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ধর্ম্মাচার্য্যগণের সহিত বিচারের ব্যবস্থা করিলেন। সেই সভাতেই বিচার আলোচনার শেষে বৌদ্ধ-দর্শনের তিনটি জটিল প্রশ্নের আশ্চর্য্য রূপ মীমাংসা করিতেই সেই প্রথম দিনেই লাসার প্রধান লামাগণের সঙ্গে তো বটেই তিব্বতশ্বরের নিকটেও তাঁহার গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। দলাই লামা ইহার পর হইতে তাঁহাকে কখনও বন্ধু, কখনও উপদেষ্টা বলিয়া সম্বোধন আরম্ভ করিলেন। এই ভাবে সেদিন এক প্রহরকাল আলোচনার পর বিদায়কালে, গৌরবচিহ্নস্বরূপ একটি মহামূল্য তিব্বতীয় ধর্ম্মাচার্য্যের পরিচ্ছদ যখন তাঁহাকে প্রদান করিলেন, তখন অবধূত প্রথমে সসম্ভ্রমেই গ্রহণ করিলেন, পরে তাহা মাথায় ঠেকাইয়া সেটি তাঁহার হাতে প্রত্যার্পণ করিয়া বলিলেন,—

আপনার অনুগ্রহ আমি জীবনে কখনও ভুলিব না। কিন্তু আমার গুরুর আদেশ এবং কাহারও নিকট নিজ ব্যক্তিগত বিদ্যা, জ্ঞান বা সাধুতার গৌরব-স্বরূপ কোন বস্তু উপহার গ্রহণ ব্যাপারে তাঁহার বিশেষ নিষেধ বলিয়াই ইহা গ্রহণ আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

তাঁহার এই কথাগুলির মধ্যে সত্যের এমনই তেজ ছিল যে দলাই লামা শুনিবামাত্রই সেই সত্য উপলব্ধি করিলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ত্যাগী বলিয়া স্বীকার এবং শ্রদ্ধায় মাথা নত করিলেন।

২৮

এই ভাবে দলাই লামার সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব ক্রমে ক্রমে দৃঢ় হইতে লাগিল। মাসাধিককাল গত হইলে এক নিভৃত মিলনের অবকাশে, জগদম্বাকে স্মরণ করিয়া যে-কর্ম্ম উপলক্ষে তিনি এখানে আসিয়াছেন ঐ যন্ত্র-সম্বন্ধে সকল ব্যাপার প্রকাশ করিলেন।

অবধূতের কথায় এক মুহূর্ত্তেই দলাই লামার তাহা স্মরণ হইল, যাহা এতকাল বিস্মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন। তিনি তখন বলিলেন,—যে-দস্যুদল উহা লুঠ করিয়াছিল, তাহারা বোধ হয় ধরাও পড়িয়াছিল। বলিয়া, সেই মণিময় যন্ত্রটির অনুসন্ধানের ফলাফল যাহা অপরাধ বিভাগের দপ্তরে ছিল তাঁহার এক কর্ম্মচারী দ্বারা তাহা আনাইয়া বৃত্তান্ত বিবৃত করিতে আজ্ঞা করিলেন। সে সেই বৃত্তান্ত আদ্যন্ত যাহা শুনাইল তাহা এইরূপ,—

হরি যাকে রাখেন

যে সকল দস্যু চিগাচ্চি লামার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছিল—তাহারা সিকিম ও তিব্বত রাজ্যের সীমান্তবাসী মুসলমান। তাহারা পশুলোম, মৃগচর্ম্ম-ব্যবসায়ী পরিচয় দিয়া উভয় দেশেই ব্যবসা করিত আর সুযোগ বুঝিয়া দস্যুবৃত্তিও করিত। তাহারা বাংড়িতে চিগাচ্চি লামার সবকিছুই লুণ্ঠন করিয়া দ্রুত দলবল সহ সিকিমে প্রবেশ করে এবং গড়তোক দিয়া কয়েক দিনে দারজিলিং-এ উপস্থিত হয়। সেখানে তাহারা প্রায় এক সপ্তাহ ছিল এবং বাজারে পশুলোম, মৃগচর্ম্ম, চামর, মৃগনাভি ইত্যাদি ব্যবসায় কর্ম্মে প্রায় দুই সপ্তাহ থাকে। রত্ন-যন্ত্রটি ইতিমধ্যে ঐ স্থানেই বিক্রয়ের চেষ্টা করে। ওখানে সুবিধা হইবে না বুঝিয়া, তাহার দলের অপর সকলকে রাখিয়া দলপতি সঙ্গে পাঁচজন মাত্র লইয়া কলিকাতা যাত্রা করে। কথা এই থাকে যে, উহা বেশী দামে বিক্রয় করিয়া তাহারা এখানে ফিরিয়া তাহাদের সকলকার অংশ বণ্টন করিয়া দিবে। তাহারা অনুমান করিয়াছিল যে ঐ বস্তুটি নিশ্চয়ই মূল্যবান সুতরাং কলিকাতা ছাড়া অন্যস্থানে বিক্রয় সম্ভব নয়।

কলিকাতায় আসিয়া তাহারা বুঝিল যে রাস্তা-ঘাটে উহা বিক্রয় চলিবে না, কোন বড় দোকানে যাওয়া আবশ্যক। কিন্তু হঠাৎ ঐরূপ দীনবেশে কোন বড় দোকানেও ত যাওয়া যায় না, চোর বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে,—তাই, উহাদের যে দলপতি সে একদিন একটু ভদ্রভাবে সাজিয়া অপর চারজনকে দূরে থাকিতে বলিয়া, বড়বাজারের মধ্যে হ্যারিসন রোডের উপরে এক জহুরীর দোকানে গেল।

দোকানদার একজন বড়বাজারের অধিবাসী। সে দেখিয়াই বুঝিল যে উহা একটি অমূল্য বস্তু। সে বলে যে, একদিন রাখিয়া গেলে পরদিন দাম বলিতে পারিবে। কিন্তু তাহাতে দলপতি রাজী হইল না। তখন ঐ দোকানের একজন ভব্যযুক্ত লোক তাহার সঙ্গে বাহিরে আসিয়া আড়ালে ডাকিয়া বলিল যে, তাহার সঙ্গে গেলে সে উহা অনেক দামে বিক্রয় করিয়া দিতে পারিবে।

কত আন্দাজ ইহার দাম হইতে পারে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে, দশ হাজারের কম নয়। বিশ্বাস করিয়া সে তাহার সঙ্গে যায়। এই ভাবে তাহাকে এ-গলি সে-গলি ঘুরাইয়া একটা বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া বেশ সাজানো একটা ঘরে তাহাকে বসায়। তাহার চারজন সঙ্গী দূরে-দূরে পিছনে আসিতেছিল, দুইটি গলি পার হইয়া তাহারা আর তাহাদের দেখিতে না পাইয়া অনেকক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরিতে লাগিল।

এদিকে সেই ভদ্রলোক তাহাকে বসাইয়া গেল, আর অল্পক্ষণ পরেই চার পাঁচজন বলবান গুণ্ডা আসিয়া তাহাকে কাবু করিয়া ঐ রত্নময় যন্ত্র কাড়িয়া লইল। শেষে অচৈতন্য অবস্থায় চোখ-মুখ হাত পা বাঁধিয়া সেই ঘরেই ফেলিয়া রাখিল। পরে গভীর রাত্রে তাহাকে ধরাধরি করিয়া অনেক জায়গা ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া শেষে, একটা গলির মধ্যে তাহাকে শোয়াইয়া সকলে চলিয়া গেল।

দলাই লামার কর্ম্মচারী অতঃপর বলিল,—

কলিকাতায় আমাদের এজেণ্টের কাছে যখন খবর যায়, তখন জানা গেল সহজেই পুলিশের সাহায্যে ঐ পাঁচজন ধরা পড়ে আর তাহারা সকল-কিছু স্বীকার করে—এবং বলে যে উহারা এই সকল ব্যাপার পূর্ব্বেই ওখানকার পুলিশকে জানাইয়াছিল। বড়বাজারে এমন সব গলি আছে আর এমন সব পাশপাশি, গায়ে গায়ে লাগা ভয়ঙ্কর বাড়ি আছে, যেখানে দিনমানে পথিক লোককে ভুলাইয়া একবার কোন কৌশলে ঢুকাইতে পারিলে আর তাহাকে বাহিরে আসিতে হয় না। ঐখানকার গুণ্ডাদের হাতে ঐসব বাড়ি,—কেহ জহরতের একখানা দোকান ফাঁদিয়া, কেহ বা মূল্যবান বেনারসী কাপড়-চোপড়ের দোকান, কেহ মসলার দোকান এই ভাবে এক একটা দোকান ফাঁদিয়া পুলিশের চক্ষে ধুলা দিয়া দিনে-রাতে ঐ কারবার চালাইতেছে। ওখানকার স্থানীয় পাহারাওয়ালারাও সকলেই তাহাদের টাকায় পুষ্ট হইতেছে—অধিক আর কি—বড়বাজারকে পুলিশ পর্য্যন্ত ভয় করে। বড়বাজারের কোন অপরাধীর বড়বাজারের মধ্যে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা নাই।

এই সকল খবর পাইয়া গোয়েন্দা-বিভাগের উচ্চপদস্থ একজনকে তিব্বতীয় সরকার ঐ মণিময়-যন্ত্র উদ্ধারের কাজে লাগাইয়াছিলেন। তাহার অনুসন্ধানের বিবরণ এই যে, সিকিমে গড়তোক, দারাজিলিং হইয়া কলিকাতায় তাহাদের উপস্থিতি এবং বড়বাজারে বিক্রয় চেষ্টা, শেষে সেখানকার ডাকাত গুণ্ডার হাতে লাঞ্ছনা পর্য্যন্ত বিবরণ তাহাদের অনুসন্ধানের ফল যা আগে বলা হইয়াছে ; তারপর ঐ যন্ত্র প্রথমে যাহাদের হাতে পড়িয়াছিল, তিনটি দিনের পর বাঁকে বিহারী নামক একজন গুণ্ডা সর্দ্দার কৌশলে উহা হাত করে আর সেই রাত্রেই হাওড়ার রেলে উঠিয়া পালাইয়া যায়। তাহার দেশ ভাগলপুর কিন্তু সেখানে তাহার কোন পাত্তাই পাওয়া যায় নাই, ঐ পর্য্যন্তই অনুসন্ধানের শেষ। এই সকল সংবাদ চিগাচ্চিতে লামার নিকট পাঠানো হইয়াছে।

কলিকাতা হইতে ঐ পাঁচজন দস্যুকে লাসায় আনা হয়, দারজিলিং হইয়া আসিবার সময় যখন দলের অপর অপরাধীগুলির খোঁজ করা হইল, তাহারা সঙ্গীদের অবস্থা জানিতে পারিয়া পূর্ব্বেই সরিয়া পড়িয়াছিল। লাসায় আসিয়া ঐ পাঁচজনকে পূর্ণরূপেই দণ্ডভোগ করিতে হইয়াছে।

শেষে দলাই লামা বলিলেন,—কিন্তু এত সত্ত্বেও যন্ত্রটি পাওয়া যায় নাই। আমার মনে আছে চিগাচ্চি লামা এখান হইতে বিষণ্ণ চিত্তে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে কোন প্রকারেই সুখী বা প্রসন্ন করিতে পারি নাই। এখনও সেজন্য আমার দুঃখ আছে। বলাই বাহুল্য, অবধূতের নিকট উহা প্রাপ্তিতে দলাই লামা পরম প্রীত হইয়াছিলেন, কারণ তিনি কল্পনাও করেন নাই যে ঐ বস্তু এই ভাবে আবার পাওয়া যাইবে। বুদ্ধ ভগবানের অপার লীলা স্মরণ করিয়া তিনি বলিলেন, এই ব্যাপারে আপনি অপরিশোধনীয় ঋণে আমাদের বাঁধিয়াছেন, আপনি যে দৈব-প্রেরিত সে বিষয়ে আমার আর কোন সন্দেহ নাই। এখন বলুন কি করিতে হইবে?

অবধুত বলিলেন, যখন এতটা করিলেন তখন আমায় চিগাচ্চিতে পাঠাইয়া দিন, আমি তাঁহার সঙ্গ লাভ করিয়া ধন্য হইব আর নিজ হাতে ঐ মণিময় সিদ্ধযন্ত্রটি তাঁহাকে দিয়া আমার সকল শ্রম সফল করিব। দলাই লামা তাঁহার কথা শুনিয়া বাহু প্রসারিত করিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, বলিলেন, মহাত্মন্, আপনার পদার্পণ তিব্বত ভূমি পবিত্র করিতে!

এক সপ্তাহের মধ্যে সকল আয়োজন ঠিক হইয়া গেল, সঙ্গে কোন রক্ষী লইতে তিনি স্বীকার করিলেন না, কেবল দুইজন লামা সহচর আর মালপত্র লইয়া একটি পশু মাত্র সঙ্গে যাইবে।

২৯

এই ভাবে বন্ধু, ভক্ত, গুণগ্রাহী তাপস, মিত্র, লামা ও লাসার বন্ধুবর্গ এবং সাধু-মণ্ডলীর শুভ ইচ্ছা, প্রীতি-সম্ভাষণ ও বিদায় লইয়া অবধুত চিগাচ্চি যাত্রা করিলেন; আর সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতগামী বার্ত্তাবহ দলাই লামার নির্দ্দেশপত্র-সহ অশ্বারোহণে চিগাচ্চি প্রধান মঠের মোহান্তের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া গেল। পত্রে, মোহান্তকে তাঁহার অপহৃত সিদ্ধযন্ত্রের পুনঃ প্রাপ্তির কথা জানাইয়া, যে মহানুভব পুরুষ বঙ্গদেশ হইতে উহা আনিয়াছেন এবং যিনি বৎসরাধিক কাল লাসায় থাকিয়া তাঁহার অসাধারণ শাস্ত্র-জ্ঞান, ধর্ম্মপ্রতিভা ও যোগবিভূতির দ্বারা এখানকার সকলকার নিকট হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান এবং শ্রদ্ধা অধিকার করিয়াছেন; বিনয় এবং সৌজন্যে

যিনি তথাগতের সঙ্গে তুলনীয়—তিনি স্বয়ং বহুতর ক্লেশ স্বীকার করিয়া নিজেই উহা যথার্থ অধিকারীর হাতে তুলিয়া দিবার অভিপ্রায়ে অমুক দিন লাসা হইতে পায়ে হাঁটিয়া যাত্রা করিয়াছেন। দূত মারফত এই সংবাদ পূর্বে পৌঁছিয়াছিল। সুতরাং দেড় মাস কাল পর্যটনের পর অবধূত যখন চিগাচ্চি পৌঁছিলেন ও প্রধান মঠে অতিথি হইলেন, ব্যাকুল আগ্রহ এবং শুভ উৎকণ্ঠায় মোহান্ত লামা অবধূতকে আলিঙ্গন ও সম্ভাষণ করিবার জন্ম দুই বাহু প্রসারিত করিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন।

প্রথম দর্শনেই উভয়ে প্রেমে বিহ্বল হইলেন। শ্রম-অপনয়নের অপেক্ষা না করিয়াই দুজনে আহার, বিশ্রাম ভুলিয়া আলাপ-পরিচয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। মোহান্ত লামা

অবধুতের মধ্যে এক দেবতাকে যেন বন্ধুরূপে পাইলেন,—আর অবধুত, মোহান্তের মধ্যে যেন জন্ম-জন্মান্তরের পুরানো মিত্রকে ফিরিয়া পাইলেন। মোহান্ত লামা কথা-প্রসঙ্গে বলিলেন,—আমার গুরু বলিয়াছিলেন, যদি উহা আমার সিদ্ধির পূর্ব্বে কোনরূপে অপহৃত হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে আমার সিদ্ধিব বিলম্ব আছে ততদিন, যতদিন উহা ফিরিয়া না আসে। আর ঐ সিদ্ধ যন্ত্র যদি অপহৃত হয় তবে কোন বিশেষ দৈবকর্ম্ম সিদ্ধ করিতেই হস্তান্তরিত হইবে কিন্তু আবার ফিরিয়া আসিবে এবং সিদ্ধি না হইলে আমার দেহত্যাগ হইবে না। সেই আশা বুকে ধবিয়া আজ প্রায় আঠারো বৎসর অপেক্ষা করিতেছি।

এতদিনে অবধূত ঐ সিদ্ধযন্ত্রেব দৈবশক্তির পরিচয় যথার্থরূপেই অনুভব কবিলেন। পূর্ব্বে যাহা অনুমানের বিষয় ছিল, আভাসে যাহা বুঝিয়াছিলেন—এখন যেন প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া ধন্য হইলেন। দেখিলেন, আজ তিনি কত বড় একটি দৈব সম্পদের অধিকারী হইয়া তাহার যথার্থ সম্মান বক্ষা কবিতে পারিয়াছেন,—এ ব্যাপাবে নিজ গুরুদায়িত্বের কথা ভাবিয়া নির্ম্মল আত্মপ্রসাদে তাঁহার অন্তরক্ষেত্র পূর্ণ হইয়া গেল, এ আনন্দের তুলনা নাই!

সকল অবস্থায়ই,—দস্যু-হস্তে যাওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহাব নিজ হাতে আসা পর্য্যন্ত, নানা বিচিত্র অবস্থার মধ্যে, ঐ দৈবযন্ত্র কি ভাবে নিজ শক্তিব পবিচয় দিয়াছে ভাবিতে বিস্ময় লাগে। প্রথম পাঁচজন লুণ্ঠনকারী দস্যুর পক্ষে উহা মৃত্যু দণ্ডেব কারণ হইয়াছে। তারপর—বড়বাজারের গুণ্ডাদেব মধ্যে শেষে যাহাব হাতে পড়িয়াছিল তাহার কি হইল জানা যায় নাই। তাবপর কাপালিকের হাতে পড়িয়া অষ্টম দিনে সিদ্ধির পরিবর্ত্তে তাঁহার মৃত্যু ঘটাইয়াছে, অবশেষে অনাদির হাতে অর্থাৎ করালী ভৈরবেব হাতে দীর্ঘ আঠারো বৎসর কাল থাকিয়া, তাঁহাকে যে-ভাবে ধনসম্পদ এবং ভোগের উপকরণ যোগাইয়াছে—তাহাতে বোধ হয়, যাহাতে আবার উহা কোনরূপে হস্তান্তরিত না হয় এই উদ্দেশ্যই ইহাব মূলে ছিল। এরপর যথাসময়ে উৎকট রোগের পীড়নে তাঁহাকে যথোচিত দণ্ডিত ও প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া শেষে তাঁহারই হাতে আত্মসমর্পণ, বহু সংখ্যক সুবর্ণ খণ্ড পূর্ণ দ্বাদশটি কলস দক্ষিণা-সহ। অপূর্ব্ব ব্যাপার! করালীর সুকৃতিবশতঃ নিদানপীড়া এবং রোগমুক্তি এই উভয় ব্যাপারের উপলক্ষ হইয়া যথা সময়েই তাঁহাকে উচ্চগতি দিয়া শেষে তাঁহার নিজের অধিকারে আসা,—যেন চরম শুভ আশীর্ব্বাদ-রূপে

সর্ব্বার্থসিদ্ধি করিতে। এই উপলক্ষে তীর্থ ভ্রমণ যাহা তাঁহার বহুকালের সাধ, তাহা পূর্ণ করিয়াছে এবং সেই সূত্রে তাঁহার গুরুর আবিষ্কৃত যোগদর্শনের প্রচার আর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যা, ধর্ম্ম ও সাধনার ক্ষেত্রে তাঁহার অসাধারণ প্রতিষ্ঠা, সেই সূত্রে শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ মোহান্ত ও যোগী লামা হইতে ওখানকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দলাই লামার বন্ধুত্বলাভ,—এবং সর্ব্বশেষে মহাযন্ত্রটি, তাহার যথার্থ অধিকারী চিগাচ্ছি লামার সিদ্ধির জন্য যথাসময়ে তাঁহারই হাতে সমর্পণের দায়িত্ব এবং সুযোগ দিয়া, তাঁহাকে অতুলনীয়রূপে পুরস্কৃত করিয়া তাঁহার জীবন সার্থক ও ধন্য করিয়াছে। চিগাচ্ছি লামার আসন্ন সিদ্ধি এবং তাহার কারণ স্বরূপ মহামহিমাময় এই সিদ্ধযন্ত্রকে তিনি মনে মনে বার বার প্রণাম করিলেন। শক্তিরাজ্যে এই অদ্বিতীয় যন্ত্রটি তাঁহার জীবনে দর্শন, অধিকার এবং প্রত্যর্পণের মধ্যে যে অপূর্ব্ব রহস্য তাহা আজ সম্পূর্ণরূপেই নিজেকে উদ্ঘাটিত করিয়া তাঁহার অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধিৎসা পূর্ণ করিয়া দিল।

চিগাচ্ছি লামা তাঁহাকে ছাড়িলেন না, তাঁহার সিদ্ধির সহায় হইয়া যখন আসিয়াছেন তখন এই কালটুকু, যতদিন না তাঁহার সিদ্ধিলাভ হয় ততদিন তাঁহাকে এখানে থাকিতেই হইবে এই অনুরোধ করিলেন। অবধূত তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ করিতে এবং তাঁহার ধর্ম্মবন্ধুর সাধ পূর্ণ করিতে, তাঁহার কল্যাণার্থে রহিয়া গেলেন। ক্রমে উভয়েই উভয়ের এতটা ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িলেন যেন তাঁহাদের যুক্ত আয়াস ব্যতীত একক কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া অসম্ভব বোধ হইতে লাগিল। অবধূতের অভিজ্ঞতা লক্ষ্য করিয়া লামা মিত্রের নিশ্চিত ধারণা হইয়া গেল যে অবধূতের সহায়তা ব্যতীত তিনি সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন না। আর অবধূত দেখিলেন, জগদম্বার যোগাযোগেই এ সময় এই সিদ্ধিকামী লামার সহায়তা করিতেই যেন তাঁর এখানে আসা। কাজেই ঐক্যবদ্ধ দুজনে উভয়ের প্রীতি এবং কর্ত্তব্য ব্যাপারে যাঁর যতটা শক্তি,—উভয়েই তাহা পূর্ণরূপে প্রয়োগ করিয়া পরস্পরের কল্যাণে নিয়োজিত করিলেন। অবধূত কায়মনো-বাক্যে লামার তারা-সিদ্ধি কামনা করিলেন আর লামা, অবধূতের অভীপ্সিত সর্ব্বের সিদ্ধির কামনা করিলেন।

যন্ত্রটি আসিয়াছে, নিশ্চয়ই—সিদ্ধ গুরুবাক্য অনুসারেই, লামার সিদ্ধির কারণেই আসিয়াছে। ইহা বুঝিয়াই লামার আশা হইয়াছে যে বন্ধু অবধূতকে তাঁহার উত্তরসাধক রূপে পাইতে পারিবেন। আর অবধূত ভাবিলেন,—তারা-সাধনার প্রকরণ এবং পদ্ধতি লক্ষ্য করিবার

এবং আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতি দেখিবার সুযোগ বড় সহজ যোগাযোগের ফলে ঘটে নাই বিশেষতঃ তীর্ব্বতীয় পদ্ধতি,—যাহা বঙ্গদেশে নাই। তারা-সাধনার পন্থা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন, তন্ত্রমতে এত বড় কঠিন সাধন আর নাই, সেই জন্য বাঙ্গলায় উহার প্রচলন নাই। অবধূতের সাধন এবং সিদ্ধির পথ ছিল ভিন্ন, কিন্তু সিদ্ধির পর তাঁহার অন্যান্য মার্গের সম্বন্ধে বিশ্বাস ছিল এবং ফলাফল সম্পর্কে কৌতূহল থাকায় তিনি ধর্ম্ম মার্গের অনেক কিছুই দেখিয়াছিলেন। তিনি তাই জানিতেন যে এই সাধনে গুরু দায়িত্ব থাকে এই উত্তর-সাধকের। এই তারা-মন্ত্র সিদ্ধির অধিকারে সাধারণতঃ, সাধকের নিজ শক্তি বা স্ত্রী অথবা গুরুই উত্তরসাধকের উপযুক্ত। কোন কোন ক্ষেত্রে সাধক অপেক্ষা শক্তিশালী না হইলে আবার উত্তরসাধকও হওয়া যায় না, আর সেই জন্য গুরুই কাম্য। অনেকের, উপযুক্ত উত্তর-সাধক বা সাধিকার অভাবে বহুকালের সাধনা নষ্ট হইয়া গিয়াছে—এরূপ অনেক দেখা যায়। লামার সাধনার কতকাংশ অনেক আগেই সম্পূর্ণ হইয়াছিল, সিদ্ধির পূর্ব্বে এমন কতকটা কর্ম্ম ছিল যাহার জন্য উত্তরসাধকের প্রয়োজন। তাহার পরেই সিদ্ধির সহজ পথ। যাহা হোক, এখন লামা অবধূতকে উত্তরসাধক রূপে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন বটে,—কিন্তু একটা সঙ্কোচ আসিয়া প্রস্তাবটি সাক্ষাৎভাবে উত্থাপন করিতে বাধা দিতেছিল অবধূত ভিন্ন দেশীয় বলিয়া। অথচ বুঝিতে পারিয়াছিলেন দৈব প্রেরিত অবধূতের তুল্য কল্যাণকামী বন্ধু তাঁহার আর এজগতে কেহই নাই।

এই সঙ্কোচই মায়ার খেলা! অবধূত কি উত্তরসাধকের দায়িত্ব লইবেন? একে ত এই সিদ্ধ-যন্ত্রটি তাঁহারই অনুকম্পায় পাইয়াছেন, তাহার উপর আবার? তখন তাঁহার গুরু-বাক্য স্মরণ হইল।

আর ঠিক সেই সময়েই অবধূত আসিয়া স্বতপ্রবৃত্ত হইয়া এই কথাগুলি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার গুরু কি আছেন,—তিনি কি উত্তরসাধক হইবেন? লামা বলিলেন যে, তাঁহার গুরু আজ আট বৎসর পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়াছেন। একশত ছয় বৎসর বয়সে উর্গায় তিনি শরীর রাখিয়াছেন। পরে বলিলেন,—কাজেই তাঁহাকে ত পাইবই না। তবে, তিনি আমায় যখন এই যন্ত্রটি দেন তখন বলিয়াছেন যে আমার সিদ্ধির সময় উত্তর-সাধক আপনি আসিয়া উপস্থিত হইবেন, আমায় সেজন্য কোন উদ্বেগ ভোগ করিতে হইবে না। এতটা ভবিষ্যৎ দৃষ্টি ছিল তাঁর।

শুনিয়া অবধূত বলিলেন, তাহলে আমাকেই তিনি আপনার উত্তরসাধক করেছে

পাঠিয়েছেন বোধহয়, সে বিষয়ে আপনার কোন সন্দেহ আছে কি? কোনও উত্তর না করিয়াই তৎক্ষণাৎ লামা অবধূতকে আলিঙ্গনপাশে দৃঢ়বদ্ধ করিলেন।

এইবার সাধক ও উত্তরসাধক মিলিত যে শক্তির স্ফুরণ হইল, তাহাতেই লামার সিদ্ধি সম্পূর্ণ হইতে আর কোন বাধা রহিল না। উপরন্তু তিব্বতীয় সাধন ক্রম সম্পূর্ণরূপে অবধূতের মধ্যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লব্ধ সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল।

৩০

প্রায় পাঁচটি বৎসর তিব্বতে কাটাইয়া অবধূত অর্ক যখন ভারতে ফিরিলেন তখন য়ুরোপের মহাসমর চলিতেছে। লোকনাথের কর্ত্তৃত্বে যে বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার কোন ক্ষতি হয় নাই বরং এই যুদ্ধের ব্যাপারে তাহাদের কর্ম্মশালায় ভারত সরকার তরফের অনেক কিছু চালানি-দ্রব্যের কাজ চলিতেছিল। বহুবিধ যুদ্ধের প্রয়োজনীয় বস্তু উৎপন্ন হওয়ায় রেল কোম্পানি এবং ভারত গভর্ণমেণ্ট সাক্ষাৎ ভাবে খরিদ্দার হওয়াতে কর্ম্মক্ষেত্র আরও বিস্তৃত ভাবে গড়িতে হইয়াছে। বিশেষতঃ মেসোপটেমিয়ায় বহুল পরিমাণে মাল-সরবরাহের কাজ পাইয়া লোকনাথের প্রতিষ্ঠানটি অন্যান্য দেশীয় প্রতিষ্ঠানের ঈর্ষার বস্তু হইয়াছিল। তিনটি বৃহৎ শিল্প-বিদ্যালয় ও তৎসংলগ্ন বিরাট কর্ম্মশালা হইতে বহুতর কর্ম্মদক্ষ যুবা জাপান, জার্ম্মানী, ইংলণ্ড ও মার্কিনে শিক্ষা সম্পূর্ণ করিতে যাত্রা করিয়াছে এবং তার মধ্যে কেহ কেহ প্রত্যাগত হইয়া দেশের চারদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল।

তা ছাড়া বাঙ্গলায় দুইটি ও বিহারে একটি সাধারণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেখানে বিনা বেতনে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল,—ইউনিভারসিটির ম্যাট্রিক পর্য্যায় শেষ হইলেই শ্রমশিল্প বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার নিয়ম। এইভাবে তিনটি কেন্দ্রে প্রায় দুই হাজার শিক্ষার্থী বালক, এবং প্রায় ততগুলি বালিকা পৃথক ভাবে শিক্ষা পাইত। সহরে নয়, পল্লীগ্রামেই যতটা সম্ভব শিক্ষাকেন্দ্র প্রসারিত করিবার মূল উদ্দেশ্য এবং তাহা উত্তর-উত্তর সেই দিকেই অগ্রসর হইতেছিল ইহা লক্ষ্য করিয়া অবধূত পরমানন্দ লাভ করিলেন। বালিকারাও পৃথকভাবে কতক দূর পর্য্যন্ত পড়িয়া, তাহার মধ্যেই শিক্ষনীয় কর্ম্ম যাহা কিছু শিক্ষা করিয়া, কোন ছোট বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রী-হিসাবে প্রবেশ করিতে পারিত। কিন্তু লোকনাথের আসল উদ্দেশ্য ছিল বালিকাদের উৎকৃষ্ট গৃহিণী প্রস্তুত করা,—অর্থোপার্জ্জনের দিকে উৎসাহ দেওয়া হইত না। লোকনাথের উদ্দেশ্য, প্রাচীন-প্রথা অনুসারে নারী গৃহলক্ষ্মী হইবে আর পুরুষ উপার্জ্জন করিয়া সংসারী হইবে।

তবে এই সাধারণ নিয়ম ব্যতীত কেহ সন্ন্যাসী জীবনের প্রতি আসক্ত হইলে সে পথে তাহার কোন বাধাই ছিল না, অনায়াসেই যাইতে পারিত। লোকনাথের কর্ম্মশালার ব্যবস্থা ছিল চমৎকার। তিনটি মূল কর্ম্মশালা হইতে বহুতর গ্রাম্য-শাখা বিস্তৃত হইতেছিল। তাহার উপর রামকৃষ্ণ মিশনের অনুসরণ করিয়া প্রত্যেক দুর্গত প্রদেশের কেন্দ্রে সাহায্য করিতে ত্যাগী যুবার বেশ বড় একটি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কাহাকেও চাঁদা দিবার অনুরোধ ছিল না, অর্থ ত যথেষ্ট ছিলই উপরন্তু প্রচুর অর্থ কর্ম্মশালা হইতে আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল এই যুদ্ধের সময়ে। তিনটি প্রধান স্বাস্থ্যকর স্থানে, আলমোড়া, দারজিলিং এবং বৈদ্যনাথ ধাম—এই তিনটি স্বাস্থ্যকর স্থানে প্রায় শতাধিক আরোগ্যকামী দরিদ্র-ইতর-ভদ্র নির্ব্বিশেষে ঔষধ পত্র, চিকিৎসা ও সেবা পাইয়া উপকৃত হইতেছিল। কোথাও রোগ, মহামারীর খবর পাইলেই কেন্দ্র হইতে উপযুক্ত ব্যবস্থা হইত। লোকনাথের কর্ম্ম-কৌশল, কর্ম্মী-গঠনের অপূর্ব্ব সাফল্য দেখিয়া—তাহার চিন্তার প্রসারতা এবং জাতীয় কল্যাণের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া, বিশেষতঃ সর্ব্বোপরি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে একশত ত্রিশজন শিক্ষাপ্রাপ্ত দেশের যুবাকে জাপানে, এমেরিকায় ইংলণ্ডে ও জার্ম্মানীতে প্রেরণ করায়—দেশে কর্ম্ম এবং শিক্ষা-বিস্তারের মহৎ উদ্দেশ্য বুঝিয়া মুগ্ধ অবধূত আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধায় তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। লোকনাথের পক্ষপাতশূন্য কর্ম্ম এবং সর্ব্ববিষয়ে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে শিক্ষা ও সুযোগদানের সঙ্কল্পসিদ্ধির পরিচয় পাইয়া আনন্দে তাঁহার বিশাল হৃদয় পূর্ণ হইয়া শেষে বিস্ময়ে পরিসমাপ্তি ঘটিল যখন লোকনাথ তাঁহাকে অবসরকালে একটা তালিকা দেখাইলেন—তাহাতে প্রত্যেক কর্ম্মী এবং শিক্ষার্থীর বয়স, নাম, ধাম, জাতি ও ধর্ম্ম তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। বিহারের মধ্যে উহা প্রতিষ্ঠিত হইলেও সুদূর আসাম, বাঙ্গলা, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল এমন কি পাঞ্জাব হইতেও ছাত্র ও কর্ম্মী আসিয়াছে। সর্ব্বশেষে দেখা গেল বঙ্গ সন্তানের সংখ্যা সর্ব্বঊর্দ্ধে; শিক্ষার সুযোগ তাহারাই বেশী লইয়াছে। সত্য সত্যই এ এক চমৎকার ব্যাপার যে প্রথম হইতে কোন প্রকার পক্ষপাত না থাকিলেও এবং বাঙ্গলার বাহিরের প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্বেও বাঙ্গলার যুবারাই প্রতিষ্ঠানটি উজ্জল করিয়াছে কিন্তু শ্রমমূলক সকল কর্ম্মেই ঐ প্রদেশের লোক প্রত্যেক কেন্দ্রেই বেশী। লোকনাথের এই বিষয়ে মন্তব্যও শুনিলেন, এবং অবধূত বুঝিলেন যে শ্রমের গৌরব বাঙ্গলার অধিবাসী ততটা বোধ করে না;—সূক্ষ্ম মস্তিষ্কের কর্ম্ম চিন্তা প্রসূত অপেক্ষাকৃত স্বল্প কায়িক শ্রমমূলক কর্ম্মই তাহাদের লোভনীয় এবং তাহাদের প্রকৃতির অনুকূল।

ইতিমধ্যে চারজন বাঙ্গলার এবং তিনজন উত্তর পশ্চিমের যুবা বিদেশীয় শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া ফিরিয়াছে;—লোকনাথ তাহাদের অবধূতের নিকট লইয়া আসিলেন;—তাহার মধ্যে শচীন্দ্র নামক একটি এই বিহার প্রবাসী ছাত্র ছিল। অবধুত তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন,—সে সিভিল এনজিনীয়ারীং-এ সুবর্ণ পদকলাভ করিয়াছিল;—আর গোপাল দত্ত নামক একটি পশ্চিমাঞ্চলের যুবক ডাক্তারী পাশ করিয়া আসিয়াছিল—এই দুইজনকে মনোনীত করিয়া রাখিলেন। পরে তাহারা বিদায় লইলে তিনি লোকনাথকে বলিলেন, কেন্দ্রের বিস্তার আবশ্যক হইয়াছে, তুমি শচীন্দ্রকে বাঙ্গলায় কলিকাতা ব্যতীত অন্য যে কোন নগরে—ঢাকা হোক কিম্বা মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম—যে কোন স্থানে পাঠাইয়া একটি কেন্দ্রের পূর্ণ কর্ত্তৃত্বের ভার দিয়া পাঠাও আর গোপালকে তার জন্মভূমিতে কোনোও স্থানে চিকিৎসায় ভার দিয়া পাঠাও। লোক নির্ব্বাচনে একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

এদিকে করালীকে শীর্ষস্থানে রাখিয়া কহলগাঁয়ের মধ্যে, তাঁহারই আশ্রম-সংলগ্ন স্থানে একটি সাধারণ বিদ্যালয় এবং শ্রমশিল্পের বৃহৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আর ভৈরব করালী নামে তিনি পরিচিত নন—এ নামের পরিবর্ত্তে তিনি অর্কপদ এই নাম গ্রহণ করিয়াছেন। সবল ও সুস্থ শরীর, মন লইয়া তিনি এখন সর্ব্বকর্ম্মে তৎপর হইয়া নানাবিধ লোককল্যাণের কাজে লাগিয়াছেন। অবধূতকে দেখিয়া করালী পাদস্পর্শ করিতে গেলেন, কিন্তু অবধূত তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া বলিলেন, আপনার জন্যই এসব; দেখেছেন, মা জগদম্বা আপনাকে দিয়ে কত কাজ করিয়ে নিলেন? লোকনাথের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ দৈবব্যাপার, নয় কি?—করালী কৃতার্থ হইলেন এবং যে সকল কথা বলিলেন, কেহ কখনও তাঁহার মুখে আর কখনও শুনে নাই। যাই হউক শেষে ভৈরব এমনই একটি তত্ত্ব বাহির করিল যাহা শুনিয়া অবধূত পরমবিস্ময়ে কতক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন;—করালী ভৈরব বলে কি? সেই আমকাঠের মহা সিন্দুক এখনও পর্য্যন্ত খোলাই হয় নাই! সেই মোহরপূর্ণ কলসগুলি ঠিক তেমনই আছে উহার মধ্যে। লোকনাথ এখনও পর্য্যন্ত উহার চাবিটি গ্রহণ করেন নাই। এখনও সিন্দুকটি আমাকেই আগলাতে হচ্চে। প্রভু! তবে আমার মনে কোন গুরুভার চেপে নেই সেজন্য। এইটুকুই আমার বাঁচোয়া। বিচক্ষণ লোকনাথ বিনা প্রয়োজনে খুলিবেন কেন? অবধূত ইহাই বুঝিয়া করালীকেও বুঝাইলেন ঐ কথা। তাহার পুণ্য উদ্যমই ধনের অভাব রাখে নাই;—পর্য্যাপ্ত ধন আসিয়াছে, তাহাতেই কর্ম্ম বিস্তৃত হইয়াছে।

হরি যাকে রাখেন

এখনও পর্য্যন্ত পার্ব্বতীর সঙ্গে দেখা হয় নাই,—অবধূত, লোকনাথের বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র পরিদর্শন করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াই শেষে পার্ব্বতীর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন।

অবধূত এখানে আসিয়া প্রথমেই লোকনাথের মুখে পার্ব্বতীর মধ্যে মধ্যে অসুখের কথা শুনিয়াছিলেন। লোকনাথ পার্ব্বতীর জন্য বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার উদ্বেগের সীমা ছিল না—কারণ, আজ প্রায় দুই বৎসর হইতে চলিল পার্ব্বতীর মূর্চ্ছারোগ হইয়াছিল। অন্ততঃ—ওখানকার সকলকার ইহাই অনুমান যে এটা মূর্চ্ছারোগ। একাদিক্রমে দু'দিন তিন দিন অচৈতন্য,—এমন কি মৃতবৎ পড়িয়া থাকিতেন, তারপর সংজ্ঞা হইলে যেন কিছুই হয় নাই এভাবে চলিতেন'। বিশেষ লোকনাথ প্রভৃতি সকলের দুঃখের কথা এই—তিনি কিছুতেই চিকিৎসা করাইবেন না বা কারো কোন পরামর্শ বা চিকিৎসকের সাহায্য লইতে রাজী হন নাই। লোকনাথ এখন অবধূতকে পাইয়া বলিলেন যে এখন আপনি যখন এসে গিয়েছেন তখন আর আমার কোন উদ্বেগ নাই। অবধূত সেইজন্য প্রথমেই পার্ব্বতীর কাছে যান নাই বা দেখা করেন নাই। সকল কাজ সারিয়া, লোকনাথের প্রতিষ্ঠানের সকল কিছু দেখা শুনা হইলে, যখন আর কিছু করিবার নাই তখন নিশ্চিন্ত মনে তিনি পার্ব্বতীর আশ্রমে উপস্থিত হইবেন। এখন সেই শুভ অবসর। আশ্রম বড় হইয়া সারি সারি ঘর, প্রায় দুই আড়াই বিঘা জায়গা জুড়িয়া বাগান,—মধ্যে পার্ব্বতীর কুটির এবং তৎসংলগ্ন মন্দির।

আনন্দ ও বিস্ময়ে অবধূত স্তম্ভিত হইলেন পার্ব্বতীকে দেখিয়া। কোনরূপ অসুস্থতার চিহ্নমাত্র নাই;—পার্ব্বতী যেন যথার্থই কৈলাসের পার্ব্বতী, ঠিক যেন তপস্যা ঘনীভূত হইয়া মূর্ত্তি লইয়াছে; আঙ্গিনা আলো করিয়া তাঁহার সুমুখে মন্দির পার্শ্বে কুটির দাওয়ায় পার্ব্বতীর মধ্যে এক সন্ন্যাসিনী মূর্ত্তির বিকাশ,—অপরূপ স্নিগ্ধ তপঃ সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত প্রতিমাখানি। সেই প্রতিমার অন্তর প্রদেশে পরম স্নিগ্ধ ঐ রূপের অন্ত-স্তলে একটু ক্লিষ্টতা, যেন ঈষৎ অবসন্ন ভাবের ছায়া। দেখিয়া অবধূত প্রাণে একটা তীব্র বেদনা অনুভব করিলেন।—মাথায় পিঙ্গলবর্ণ জটাভার, চূড়া করিয়া বাঁধা। তাহাতে গৌর আননের লাবণ্য উছলিত, নয়নে করুণা ঝরিতেছে। সে মূর্ত্তি দেখিলে ভক্তি ও শ্রদ্ধায় মাথা স্বতঃই নত হইয়া তাঁহার ঐ চরণের পানে আকৃষ্ট হয়। অবধূত মুগ্ধ হইয়া গেলেন, তাঁহার মুখে কোন সম্ভাষণই আসিল না;—যদিও দীর্ঘ পাঁচটি বৎসর পর দেখা।

৩১

অবধূত দেখিলেন, আজ আরও এক অদ্ভুত ব্যাপার যা কল্পনাও করেন নাই :—পাখা হাতে পার্ব্বতী একখানি আসনে বসিয়া, তাহার সম্মুখেই আর একখানি প্রশস্ত আসন পাতা আর প্রকাণ্ড একখানি শ্বেত পাথরের, থালায় ফলমূল, মিষ্টান্ন প্রভৃতি নানা প্রকার ভোজ্যের চারিধারে বাটিতে ক্ষীর পানা প্রভৃতি নানা পেয় সাজাইয়া অপেক্ষা করিতেছে। মনে ভাবিলেন, এ রহস্ত মন্দ নয়, কতক বিস্ময়ে কতক আনন্দে অবধূত অগ্রসর হইলেন ;—তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াই পার্ব্বতী উঠিতে গেল , দেখিয়া ঐ প্রণামের দায় এড়াইতেই অবধূত আর অগ্রসর না হইয়া ঐখান হইতেই জোড় হাতে দাঁড়াইলেন, দেবী,—দোহাই তোমার, ঐ আসন থেকে তোমার উঠতে হবে না—এ অনুরোধ রাখতেই হবে। ঠিক ঐ ভাবে বসে থাকো।

পার্ব্বতী সঙ্কেত বুঝিয়াই আর উঠিল না, কেবল বলিল—এতদিন পরে দেখা, একটা প্রণামও কবতে পাবো না ?

না,—ওটি হবে না। অবধূতের ঐ কথা শুনিয়া পার্ব্বতী বলিল, ভালো,—আমি উঠবো না, কিন্তু তোমার একেবারে এসে এই আসনে বসে আরম্ভ করে দিতে হবে তা হলে। নারায়ণের প্রসাদ, ঠাকুরকে নিবেদন হয়ে গেছে—এখন বোসো।

অগত্যা, বলিয়া অবধূত বসিলেন, গ্লাসের জলে হাত ধুইয়া আরম্ভ করিলেন। এই বিবাট পাত্রের মধ্যে ছিল না কি ? মর্ত্তের ভোগ যা কিছু, অবধূতের বোধ হইল, কিছুই বাকী রাখে নাই পার্ব্বতী। ভোজন চলিতে লাগিল। অবধূত বলিলেন ;—এত দিন পরে এই অপূর্ব্ব স্বাদু ভোজ্য যা আমার জীবনে কখনও জোটেনি, তুমি আমায় শেষে ভোজনবিলাসী করে তুলবে নাকি ?—এ যে প্রত্যেকটিই অমৃত, এতটা লোভনীয়—

পার্ব্বতী বাধা দিয়া কহিল, তুমি ভোজনবিলাসী হবে ? আর তোমায় ভোজনবিলাসী করবার ক্ষমতা আমার আছে,—এই কথাই বলতে চাইচ ?—দেখো, আজ আমার এই শুভদিনে এ ভাবের তুচ্ছ পরিহাসের প্রশ্রয় আমি দেবো না। আজ আমার সর্ব্বার্থ সিদ্ধি—নিষ্প্রয়োজনে কোন কথা চলবে না।

আজ তো দেখচি তুমি গুরু মশাইয়ের যায়গা অধিকার করলে, পার্ব্বতী ! একটু করতে দেবে না আমায় ?

সময় কোথা তার, নাও খেতে খেতে গত চার বছরের সব কিছু ঘটনার হিসাব দাও,—

অন্য কথা একটুও নয়। লোকনাথ, করালী ভৈরব, এরা ভাগ্যবান, তারা অগ্রভাগটাই পেয়েছে আমার ভাগ্যে শেষ,—প্রসাদ। আমার তাইই ভালো।

অবধূত বুঝিলেন, কথাটা বড় গভীর, অর্থপূর্ণ। তিনি আর উচ্চবাচ্য করিলেন না,—ভাল, তাই হোক যেমন তোমার ইচ্ছা—বলিয়া আরম্ভ করিলেন। শোনো তা হলে,—এখান থেকে সোজা নেপাল রাজ্যে,—সেথায় রাজ অতিথি হয়ে সকল কিছু যোগাড় যন্ত্র সম্পূর্ণ করতে বেশ কিছুদিন গেল, তারপর দীর্ঘ পর্য্যটনের পর তিব্বতের রাজধানী লাসায় উপস্থিত হলাম। বিধাতার বিধানে সেখানে এক মঠে আশ্রয় পেলাম। সেই মঠেই আমার তিব্বতী ভাষা শিক্ষা আরম্ভ হোলো মঠের থুলো লামার কাছে। পূর্ণ সতেরোটি মাস কাটিয়ে ভাষার কতক আয়ত্ব হলে পর বিধাতার বিধানে পোটালায় দলাই লামার সঙ্গে মিলনের যোগাযোগ ঘটলো, সেখানে কিছুদিন পর যথা সময়ে ঐ রত্নময় যন্ত্রের ব্যাপার তাঁর গোচরে আনলাম। তারপর তার আদি অন্ত অপহরণ কাহিনী শুনলাম।—শুনিতে শুনিতে পার্ব্বতীর হাতের পাখা স্থির, বিস্ময়ে পার্ব্বতী স্তম্ভিত নির্ব্বাক জড়বৎ।—তারপর সেখান থেকে সোজা ঐ যন্ত্রের অধিকারী চিগাচ্চি মঠে লামা দর্শনে যাত্রা করলাম। দেড় মাস, কি অপূর্ব্ব মনোরম ভূমি, কত পর্ব্বত, কত নদী, কত হ্রদ, কত কত মালভূমি অতিক্রম করে চিগাচ্চি এসে মহাতাপস থুলোলামার হাতে যন্ত্র পৌছে দিলাম ও তাঁর কোলে স্থান পেলাম,—তাঁর কাছে ঐ মণিময় যন্ত্রের পূর্ব্ব ইতিহাস জানতে পারলাম।—শেষে অবধূত বলিলেন,—দেখো পার্ব্বতী ! যা অনুমান করেছিলাম তা সত্য। জাগ্রত ঐ যন্ত্রের সকল কথার পর ঐ সম্পর্কে লামার প্রীতি ও অনুগ্রহ লাভ এবং শেষে বন্ধুত্ব হল। মিত্র ভাবের ঐ অপূর্ব্ব যোগাযোগের পরিণামে তাঁর তারাসিদ্ধির সব কিছু জানা এবং দেখাও ঘটে গেল। কি মহা গুরু কৃপা কথায় বলবার সাধ্য নাই। যাই হোক শেষে কিন্তু এমন একটা কাজ করে ফেললাম তাতে তোমার কাছে অপরাধী হয়ে রয়েছি, এখন তাই তোমার ক্ষমা চাই।

এতটা বিস্ময়কর ব্যাপার শুনবার পর এই হালকা কথাটার উত্তরে পার্ব্বতী বলিল,—

অপরাধী তো আমরাই চিরকাল, নারী জগদম্বার স্বজাতি, তাঁর হাতের নিপুণ অস্ত্র—তোমাদের সাধনচ্যুত করে বিপথে নিয়ে যাই। এ যে উল্টো কথা এখন শুনচি, তোমার অপরাধ! অবধূত অনুভব করিলেন পার্ব্বতী এখন কতটা নির্ভীক ও নিঃসঙ্কোচ হইয়াছে; পূর্ব্বে এ ভাবের কথা তাহার মুখে অসম্ভব ছিল। অবধূত আনন্দিত হইলেন,—বলিলেন,—আগে শোনো ঘটনাটা, সত্য বলব পার্ব্বতী, সেই ব্যাপারে মনে হয় যেন অপরাধ করে ফেলেছি।

এবারে দেখছি, তুমিও গৌরচন্দ্রিকা না করে কথা কইতে পারো না। এটা কিসের লক্ষণ মনে করা যায় বলতো ?

মনে করবে অপরাধটা, হয়তো নয় নিশ্চয়ই, ঢুকেচে। তা হোক, সেটা স্বীকার করে আমায় হালকা হতেই হবে। কেমন ?

হে নারায়ণ, এ আমায় কেমন গুরুর হাতে তুলে দিয়েচ! প্রভু,—গুরুর মুখে একটা বিষয় বর্ণনায় এমন ভাবে সত্যের অপলাপ আমায় সহ্য করতে হোলো শেষে ?—যাক তা হলে কাজ নেই আর ঐ অপরাধমূলক কথার আলোচনায়,—এখন শেষ কথাটা বার হলে বাঁচি!

অবধূত আগ্রহ সহকারেই বলিলেন, তাইতো বলতে চাইচি—পা—

বাধা দিচ্ছে কে ?

আমার সঙ্কোচটাই বাধা হয়ে উঠেছে পার্ব্বতী ;—এবার কিন্তু তোমার মুখ দেখেই নিঃসঙ্কোচ হতে পেরেচি। শোনো তাহলে, আমার পরমমিত্র তাঁর সিদ্ধির পর সসংকোচে প্রস্তাব করলেন যে, ঐ মণিময় যন্ত্রটি আমি যেন গ্রহণ করি, অর্থাৎ মিত্র-দক্ষিণা স্বরূপ নিয়ে আসি।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া অবধূত দেখিলেন পার্ব্বতীর অধরোষ্ঠের বিস্তার, চক্ষে একটা কৌতুকের ঔজ্জল্য, অতীব মনোমুগ্ধকর। পার্ব্বতী বলিল, তারপর ?

তারপর যা তা তো তুমি বুঝেই নিয়েছ।

ঐ মণিময় যন্ত্রটি রক্ষার সর্ত্তগুলি এবং তার ফলাফল বিচার করে ওটা গ্রহণ করতে সাহস তুমি করোনি, এই তো ? অপরাধ কোথায় এর মধ্যে ?

তা হলে অপরাধ কিছু হয়নি ? তা হলে,—বলিয়া অবধূত আবার পার্ব্বতীর মুখের পানে চাহিলেন।

গ্রহণ না করে অপরাধ তো নিশ্চয়ই হয়নি ? অপরাধ যেখানে, সেতো তোমার মনে,—কোথায়, তাও ত তুমি জানো, দয়াময়!

অমন একটি লোভনীয় মহামূল্য রত্নালঙ্কার তোমার পক্ষে কতটা আকর্ষণের বস্তু অর্থাৎ গ্রহণ করে নিয়ে এলে তোমার কতটা সন্তোষের বিষয় হোতো, সুতরাং গ্রহণ না করাটা অপরাধ হয়েছে মনে করা এই তো ?

এইবার পার্ব্বতীর ভুবন মোহন হাসিটি দেখা গেল, থালার দিকে চাহিয়া বলিল—সত্য সত্যই যখন ও সব কিছুই মনে স্থান দাওনি, তুমি তা দিতে পারো না, তখন অনর্থক

সাধারণ নরনারীর ভাবটা কল্পনায় নিজ মনে আরোপ করে আর সেইটে নিয়ে রহস্যজনক গুরুতর একটা কিছু ফাঁদাই অপরাধ হয়েছে ;—যাক্, ক্ষমা করা গেল সেটা।

এদিকে আর এক অদ্ভুত ব্যাপার, মনের অগোচরেই অবধূতের ভোজন শেষ হইয়াছে ; এতক্ষণ বেশ কথার ফাঁকে থালা ও বাটিগুলিতে যা কিছু ছিল সব শূন্য করিয়াছেন, কিছু মাত্র অবশিষ্ট নাই। এ কি হইল ? এ যে অমানুষিক ভোজন ! অনুশোচনা ভরা বিস্মিত কণ্ঠে অবধূত বলিলেন, পার্ব্বতী ! এ সব তোমারই খেলা, এ কি করলাম আমি ?

পার্ব্বতী বলিল, তাইই তো চেয়েছিলাম আমি, ভক্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণকারী আমার সাধ পূর্ণ করেছেন। অবধূত বলিলেন,—কিন্তু আমার দিক থেকে সান্ত্বনা কোথা ? পার্ব্বতী বলিল, তুমি ভক্ত মানুষ, প্রসাদ পেয়েছ এতদিন পর,—ঠাকুরের প্রসাদের কি শেষ রাখতে আছে ?—আজ তোমার পূর্ণ প্রসাদ পাওয়া হয়েছে—যথা শাস্ত্র কাজই তো হয়েছে।

এবার আচমন শেষে অবধূত বলিলেন, পার্ব্বতী, আমার কথা খুঁটিনাটি সব কিছুই শুনলে, এবার তোমার কথা বলো ;—আমি ব্যাকুল হয়ে আছি। পার্ব্বতীর মুখে যেন একটা বেদনার প্রলেপ,—আমার কথার সবই তো তুমি জানো। অবধূত উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

অবধূতকে দাঁড়াইতে দেখিয়াই মেঘমুক্ত পূর্ণিমার চাঁদের মত পার্ব্বতীর ক্লিষ্ট ভাব নিমেষেই মিলাইয়া মুখে মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে হাসির মাধুর্য্য বর্ণনার ভাষা নাই। স্বর্গের সেই হাসিটুকুর মধ্যে ভুবন-ভরা ভাব আর ভাষা,—যাহা অবধূতই বুঝিলেন।

ঠিক যেন এত দিনে ইষ্টলাভ হইল, এইভাবে অগ্রসর হইয়া পার্ব্বতী অবধূতকে প্রণাম করিতে গেলেন। অবধূত একটু পশ্চাৎ দিকে সরিয়া আসিলেন। তাহাতে নিরস্ত না হইয়া পার্ব্বতী বাহু প্রসারিত করিয়া অগ্রসর হইতেছেন, অবধূতেও পিছু হটিতে হটিতে একটু দ্রুত পার্ব্বতীর ইষ্ট-মন্দিরে ঢুকিয়া পড়িলেন। নারায়ণই পার্ব্বতীর ইষ্ট,—ইহা অবধূতের জানাই ছিল, তবে মন্দিরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা এইবার দেখিলেন।

বেশ বড় চতুষ্কোণ ঘরখানি,—সুমুখেই মর্ম্মর বেদীর উপর ঘনকৃষ্টবর্ণ পাথরের উচ্চে পূর্ণ এক হাত পরিমিত চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি। কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই পূজার্চ্চনা শেষ হইয়াছে। অবধূত, মূর্ত্তির সম্মুখে করযোড়ে দাঁড়াইয়া অপলক নেত্রে দেখিতে লাগিলেন। বুঝি ভাবিয়াছিলেন, এইবার পার্ব্বতীর পাদস্পর্শ হইতে রক্ষা পাইলেন। কিন্তু ব্যাপার যা ঘটিল তা যেমন অসম্ভব, তেমনি অভাবনীয় আর তেমনি বিস্ময়কর ;—অবধূতেরও কল্পনার অতীত।

পার্ব্বতী মন্দিরে ঢুকিয়া দ্বারের কপাট দুটি ধীরে ধীরে বন্ধ করিয়া দিলেন। অবধূতের

সেদিকে লক্ষ্য নাই,—দৃষ্টি তাঁহার যেন দেবমূর্ত্তির মুখমণ্ডলে নিবদ্ধ। পার্ব্বতী ধীরে ধীরে,—ব্যস্ততার কোন লক্ষণ তাঁহার মধ্যে ছিল না—সেই দেবমূর্ত্তির সুমুখে আসিয়া জোড় করে গদ্‌গদকণ্ঠে বলিলেন,—আজ আমার ইষ্টের সঙ্গে সর্ব্বার্থ সিদ্ধির যোগ,—দেহ-মন-প্রাণ যাঁকে সমর্পণ করে এতদিন আজ আমার ধর্ম্মের পবিত্রতা রক্ষা করে এসেছি, আজ সেই ইষ্টের চরণ হৃদয় দিয়েই আমি অধিকার করলাম। বলিয়া হেঁট হইয়া অবধুতের পায়ের পানে হাত বাড়াইলেন। অবধূতও বাধা দিতে গেলেন কিন্তু, কি জানি কোন এক দৈবনির্দ্দেশে অদ্ভুত উপায়ে আত্ম-সমর্পণ করিয়া ফেলিলেন।

হইল কি, নিবৃত্ত করিতে গিয়া সঙ্কুচিত অবধূত,—আজানুলম্বিত বাহুদ্বারা সবলে সেই সন্ন্যাসিনী প্রতিমাকে আকর্ষণ করিয়া নিজ বিশাল বক্ষে ধারণ করিলেন। প্রাপ্তির পূর্ণতায় দেবীর চক্ষু নীমিলিত হইয়া আসিল। এইরূপে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া পার্ব্বতীর কানের কাছে তাঁহার মুখ আনিয়া বলিলেন,—সেব্য সেবিকার সম্বন্ধ আর আছে কি,—দেবী—? চেয়ে দেখ, তোমার ইষ্টের পানে। বলিয়া অবধুত সম্মুখস্থ নারায়ণ মূর্ত্তির পানে দেখিলেন,—কিন্তু, পার্ব্বতী? নারায়ণ মূর্ত্তির পানে না চাহিয়া একবার অবধুতের উজ্জ্বল প্রশান্ত মুখমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিলেন। কি দেখিলেন, কে জানে! আর অবধূতও আশু সিদ্ধির আনন্দবিভোর সেই স্নিগ্ধ নয়নের স্থির বিদ্যুৎ নিজ নয়নপথে গ্রহণ করিয়া অন্তরে কি যে অনুভব করিলেন, তাই বা কে জানে। তারপর অনুভব করিলেন যেন দুই খানি কোমল বাহু যথাশক্তি অবধুতের দেহ বেড়িয়া পশ্চাতে দৃঢ়বদ্ধ হইয়াই রহিল। তারপর উভয়েই স্থির, কোন শব্দই আর শুনা গেল না কাহারও মুখে কতক্ষণ। অবশেষে অবধুত অতি মৃদু কোমল কণ্ঠে,—কেমন, শান্তি? এই কি তোমার সাধনা ছিল? বলিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পার্ব্বতীর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

বিদ্যুতের মত একটি আনন্দের রেখা নির্ব্বাক পার্ব্বতীর ওষ্ঠাধরে খেলিয়া গেল অথচ অবধুতের মুখমণ্ডলে দৃঢ় নিবদ্ধ সে দৃষ্টি, বিস্ফারিত নয়নের সে দৃষ্টি একটুও নড়িল না। তাহার সে চাহনি দেখিয়া অবধুতের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল।

সর্ব্বগ্রাসী সে চাহনী, তাঁহার জীবনের এক অচিন্তিতপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা। বড়ই অদ্ভুত সে দৃষ্টি অবধুতের বাহ্য হৃদয় ভেদ করিয়া তাঁহার অন্তরস্থ শুদ্ধ চেতন পুরুষকে সবলে আকর্ষণ করিতেছে। সে আকর্ষণে অবধূত আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য। নির্ব্বাক বিস্ময়ে স্তব্ধ অবধুত দেখিলেন পার্ব্বতীর অধরোষ্ঠ মৃদু মৃদু নড়িতেছে, যেন কিছু বলিবার ইচ্ছায়

স্পন্দিত। যন্ত্র চালিতবৎ অবধূত তাঁহার শ্রবণকে নিকটে লইয়া গেলেন। অতীব কোমল, যেন অমৃত ক্ষরিত হইতেছে পাৰ্ব্বতীর কণ্ঠস্বরে,—অবধূতকে তন্ময় করিয়া দিল।

তুমিই আমার ভগবান ;—তুমিও জানো,—আজ আমার সর্ব্বার্থ সিদ্ধি। এই বিগ্রহ নারায়ণ সাক্ষী—আর কিছুই চাইনি।

অতি মৃদু কণ্ঠে এই কয়টি কথা বলিয়া দেবী তাহার স্নিগ্ধ অনুরাগ রঞ্জিত মুখমণ্ডল যথাসাধ্য ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিলেন। তখন অবধূত, অপরূপ আনন্দে স্পন্দিত দেবীদেহ হৃদয়ের সঙ্গে একীভূত করিয়া তাঁহার শুভ্র ললাটে একটি চুম্বন করিলেন ;—তারপর উভয়েই মুদিত নয়নে অনুভূতিতে তন্ময় রহিলেন। ক্ষণেকের জন্য, অবধূত অনুভব করিলেন একবার যেন পার্ব্বতীর বাহুবন্ধন দৃঢ় হইল, অতি নিবিড়, দুই ঘুচিয়া এক অঙ্গ হইয়া গেল, আর কাহারও বাহ্য রহিল না,—সম্মুখে ঐ নিশ্চল নারায়ণ বিগ্রহই একমাত্র সাক্ষী।

হঠাৎ পার্ব্বতীর শরীরে একটি শিহরণ, তারপরই একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস সশব্দে বাহির হইয়া গেল। অনুভব করিয়া চমকিত অবধূত চাহিয়া দেখিলেন ;—উজ্জ্বল গৌর লাবণ্যমণ্ডিত সেই মুখমণ্ডলে একটি স্বচ্ছ নীলিমার আভাস ;—দেখিতে দেখিতে উহা যেন গাঢ় হইয়া আসিল। পার্ব্বতীর শিবনেত্র লক্ষ্য করিয়া অবধূতের অন্তর ক্ষেত্র আলোড়িত এবং হৃদপিণ্ড সবলে কয়েকবার আঘাত করিয়া নিশ্চিতরূপেই জানাইয়া দিল যে—অভাবনীয়, চরম একটা কিছু ঘটিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে পার্ব্বতীর দেহলতাও শিথিল, যেন ধরণীর কোলে—সেই কোল যার উপর সকল দেহের টান, সেই চির শেষ আকর্ষণের ক্ষেত্র ধরিত্রীর কোলে লুটাইয়া পড়িতে চায়। পার্ব্বতীর প্রাণশূন্য দেহ এইভাবে এলাইয়া পড়িতেই অবধূত আর একটি চুম্বন করিলেন তাহার স্নিগ্ধ গৌর ললাটে,—তারপর নারায়ণের বেদীতলে সেই পবিত্র দেবীতনু ধীরে ধীরে শোয়াইয়া দিলেন। তখনও একটি পূর্ণ আনন্দের অনুভূতি সেই মুখে সুস্পষ্ট, সে মুখমণ্ডল তখনও জীবন্ত লাবণ্যে উদ্ভাসিত।

অবধূত একাই পার্ব্বতীর দেহ শ্মশানে লইয়া গেলেন,—এমনি করিয়া বুঝি শিব একদিন সতীকে লইয়াছিলেন,—কাহাকেও স্পর্শ করিতে দিলেন না। ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া-শেষে অর্ক আবার পথে বাহির হইলেন। লোকনাথ প্রভৃতি আর তাঁহার দেখা পান নাই।

—শেষ—